POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ؕ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ

এবং তোমার জাতি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে,অথচ ইহাই সত্য; তুমি বল, ‘ আমি তোমাদের উপর কোন অভিভাবক নহি।’

(আল আনআম: ৬৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 43

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 24 Oct, 2024 20 রবিউল সানি 1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আশ্চর্য হতে হয় যে, নামাযের সময়কে সময় অপচয় বলে মনে করা হয়, যার মধ্যে এত বেশি কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে আর যদি সারা দিন ও সারা রাত্রি হৈ হুল্লোড় ও ক্রীড়া কৌতুকে নষ্ট করা হয়,তবে তার সেটার নাম রাখা হয় ব্যস্ততা।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

নামাযে ওজুর তাৎপর্য

নামায পড়া এবং ওজু করার মাঝে রোগনিরাময়কারী কল্যাণও রয়েছে। চিকিৎসগণ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যাহ মুখমণ্ডল না ধোয়, তবে তার অক্ষিপ্রদাহ হতে পারে আর এটা ছোখের ছানির পূর্ব লক্ষণ। এর ফলে আরও একাধিক রোগ ব্যধির সৃষ্টি হয়। তবে বল, ওজু করতে কেন এত ভয়? এর উপকারিতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। মুখে পানি দিয়ে কেবল কুলকুচি করতে হয়। দাঁতন করলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, দাঁত মজবুত হয়। মজবুত দাঁতের কারণে খাদ্য ভালভাবে চর্বন করা যায় এবং দ্রুত পরিপাক হয়। এছাড়াও নাক পরিষ্কার হয়। নাকে কোন দুর্গন্ধ প্রবেশ করলে তা মস্তিষ্কের শান্তি ভঙ্গ করে। এখন বল তো,এর মধ্যে খারাপ কি আছে। এরপর সে আল্লাহ্ তা’লার দিকে নিজের চাওয়া পাওয়ার আর্জি নিয়ে যায়। সে খোদার দরবারে নিজের চাহিদাবলীর কথা নিবেদন করার সুযোগ পায়, দোয়া করার সময় পায়। নামাযের জন্য খুব বেশি হলে এক ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। কিছু কিছু নামায তো পনেরো মিনিটেরও কম সময়ে পড়া যায়। তাই আশ্চর্য হতে হয় যে, নামাযের সময়কে সময় অপচয় বলে মনে করা হয়, যার মধ্যে এত বেশি কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে আর যদি সারা দিন ও সারা রাত্রি হৈ হুল্লোড় ও ক্রীড়া কৌতুকে নষ্ট করা হয়,তবে তার সেটার নাম রাখা হয় ব্যস্ততা। ঈমান যদি শক্তিশালী হয়, শক্তিশালী ঈমান দূরে থাক, অন্তত কেবল ঈমানটুকুও থাকে, তবে এমন পরিস্থিতি কেন হল আর কেনই বা এমন দুর্দশা পর্যন্ত গড়াল?

ঈমানের এই অধঃপতন সত্ত্বেও কেউ যদি এই দুর্বলতা উপলব্ধি করে তাদের চিকিৎসা করতে চায় আর সেই পথ বলে দেয়, যে পথে চলে মানুষ খোদার নিকট হতে শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করে, তবে তাকে কাফের ও দাজ্জাল নামে অভিহিত করা হয়। আমি বলছি, এরা যদি নিশ্চয়তার সাথে একথা স্বীকার করতে না পারে যে ঈমান ফলপ্রসূ হয়, তবে অন্তত পক্ষে তারা ধারণাই করুক। ধারণা থেকেও বড় বড় পরিণাম প্রকাশ পেয়ে থাকে। দেখ, ইউক্লীডিওবাদের ভিত্তিও সম্পূর্ণভাবে কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এইরূপে মানুষের কতই না উপকার হয়েছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিজ্ঞানের ভিত দাঁড়িয়ে আছে অনুমানের উপর। তাই ঈমানকেও যদি অনুমান নির্ভর করে তোলা হয়,তবু এই বিশ্বাস থাকে যে সেটা বিফলে যাবে না। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, তারা ঈমানকে আদ্যেপান্তই এক অনর্থক বিষয় বলে মনে করে।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১)

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ।

২০৬২) উবায়েদ বিন উমায়ে এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয় নি। হয়তো (হযরত উমর) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবু মুসা ফিরে যান। এর মধ্যে হযরত উমরের কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, ‘আমি কি আব্দুল্লাহ বিন কায়েস (আবু মুসা)-র কণ্ঠ শুনেছিলাম? তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দাও। তাঁকে বলা হল তিনি তো ফিরে গেছেন।অতঃপর হযরত উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠান (এবং জিজ্ঞাসা করেন) তখন (হযরত আবু মুসা) বললেন, আমাদেরকে এই আদেশই দেওয়া ছিল (যখন অনুমতি না পাবে, তখন ফিরে যাবে)। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনাকে এ বিষয়ের সাক্ষী জোগাড় করতে হবে।’এরপর তিনি আনসারদের মজলিসে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল- এ বিষয়ে কেউ আপনার জন্য সাক্ষী দিবে না, কিন্তু সেই ব্যক্তি যে আমাদের মধ্যে সব থেকে স্বল্প বয়স্ক। অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রা.)। তখন তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা.)কে সঙ্গে করে নিয়ে যান। (তাঁর কথা শুনে) হযরত উমর বললেন: রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই নির্দেশটি কি আমার অগোচরে থেকে গিয়েছিল? বাজারের কেনাবেচা আমাকে উদাসীন করে রেখেছিল। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ব্যবসা বাণিয্য সূত্রে তিনি বাইরে যেতেন।

(সহী বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল বুইয়ু)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৩ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

যারা খোদা তা’লার ধর্মের সমর্থনে দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তা’লা তাদের সাহায্য করেন।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হজ্জের ৩৯ ও পরবর্তী আয়াতগুলির ব্যাখ্যায় বলেন: ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের অনুমতি কেবল সেই পরিস্থিতি পাওয়া যায়, যখন কোন জাতির উপর দীর্ঘকাল অপর কোন জাতির উৎপীড়ন চলতে থাকে আর অত্যাচারী জাতি তাদেরকে খোদা তা’লার নাম নিতে বাধা দেয়। অর্থাৎ তাদের ধর্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং জোর করে মানুষকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করে কিম্বা ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এবং ইসলামে প্রবেশকারীদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে শাস্তি দেয়। সেই জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতির বিরুদ্ধে জেহাদ হতে পারে না। কিন্তু যদি যুদ্ধ হয় তবে সেটা হবে রাজনৈতিক এবং দুই দেশের মধ্যেকার যুদ্ধ যা দুটি মুসলমান দেশের মধ্যেও হতে পারে। কিন্তু সেটা জেহাদ বলা যাবে না। আর সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অনিবার্য হবে না। বরং সেটা সেই সব মুসলমানদের জন্য অনিবার্য হবে যারা সেই দেশের সরকারের অধীনে থাকে, কেননা এই যুদ্ধ দেশের প্রতি ভালবাসার যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত হবে। এটা কোন ধর্মীয় যুদ্ধ হবে না আর রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেন- حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ দেশের প্রতি ভালবাসাও ঈমানের একটা অংশ বিশেষ।

এরপর বলা হয়েছে যে, যখন কোন অত্যচারিত জাতি ক্রমশ শক্তি লাভ করে, তখন অন্যান্য সকল ধর্মের হেফাযত করা এবং সেই সকল ধর্মের পবিত্র স্থানসমূহের মর্যাদা রক্ষা করা তাদের কর্তব্য। শুধু তাই নয়, সেই বিজয়কে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যম না বানিয়ে অভাবপীড়িতদের খোঁজ খবর নেওয়া, দেশের অবস্থার সংশোধন এবং অভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর করতে নিজেদের শক্তি ব্যয় করা উচিত। কেননা ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে সাক্ষী এবং রক্ষক হিসেবে, অত্যাচারী হিসেবে নয়। যারা ইসলামী জিহাদ সম্পর্কে আপত্তি তোলে, তাদের চিন্তা করা উচিত যে, সেই ধরণের যুদ্ধবিগ্রহ কি মুসলমানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যে, যখন খুশি যুদ্ধ শুরু করে দাও আর কাফেরদেরকে বন্দী বানাতে

(এরপর ৭ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, ২০১২ (মার্চ, এপ্রিল)

হুযুর আনোয়ারের দিক-নির্দেশনা

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই এই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত এবং এ কথাগুলি যখন স্মরণ হয় যে আঁ হযরত (সা.) কিভাবে মানুষের হেদায়াতের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন-আল্লাহ তা'লা বলেন, তুমি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলো না এই জন্য যে তারা ঈমান আনছে না। আঁ হযরত (সা.)-এর অবস্থা এমন হয়েগিয়েছিল আর তাঁর বাসনা ছিল যে, সমগ্র বিশ্ব যেন আল্লাহ্ তা'লার মান্যকারী হয়, তাঁর ইবাদতকারী হয়ে যায় এবং পৌত্তলিকতা বর্জন করে। এই কারণে তিনি ব্যকুল হয়ে উঠতেন এবং দোয়া করতেন, চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কাউকে হেদায়াত দান করা আমার কজ, তোমার কাজ হল কেবল তবলীগ করা। তুমি অবশ্যই তবলীগ কর, কিন্তু এতটা চিন্তিত হয়ো না যে, নিজেকে ধ্বংস করে ফেল যে তারা মুসলমান হয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা ওয়াকফীনে নওদেরও কাজ। তাদের মধ্যে একটা বিশেষ অংশ এমন হওয়া উচিত যারা জামেয়া গিয়ে মুবাল্লিগ হবে। একটা হয় সাধারণ ওয়াকফীনে জিন্দগী তথা ওয়াকফীনে নও, যারা ইঞ্জিনিয়ারও হচ্ছে, ডাক্তারও হচ্ছে আবার এডভকেটও হচ্ছে। কিন্তু। কিছু মানুষকে জামেয়াতেও যেতে হবে। এখন জামেয়াতে যাওয়া ওয়াকফীনদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অথচ আমাদের আরও বেশি সংখ্যক মুবাল্লিগ প্রয়োজন। জার্মানীতে কতগুলি শহর আছে? কতগুলি মফসসল শহর আছে? এগুলির সংখ্যা হাজার হাজার হবে। এখন প্রত্যেকটি স্থানে একজন করে মুবাল্লিগ পাঠাতে হলে আমরা পাঠাতে পারব না। খুব বেশি হলে আমাদের কাছে পনেরো থেকে কুড়ি জন মুবাল্লিগ রয়েছেন।

একটা অঞ্চলে একজন মুবাল্লিগ রাখতে হয়। হামবুর্গ শহরে মুবাল্লিগ আছেন, যিনি পুরো এলাকা কভার করছেন। অথচ এখান থেকে মাহদী আবাদ নাহে পর্যন্ত গেলে রাস্তায় তিনটি শহর পড়ে। প্রত্যেকটি স্থানে একটি করে মুবাল্লিগ রাখা উচিত। আর কেবল জার্মানীই নয়, সারা বিশ্বই আমাদের কর্মক্ষেত্র। চেষ্টা করুন যাতে কুড়ি শতাংশ ওয়াকফীনে নও জামেয়াতে যায়। অনুরূপভাবে একটা নির্দিষ্ট অংশ ডাক্তারিতেও যাওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের মাঝে এমন মানুষ হওয়া উচিত,যারা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করার পর অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিবে বা প্রচার করবে। তাই তবলীগের একটা অনেক বড় কাজের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে অর্পিত আছে। এ দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। অন্যথায় আট-দশ জন ছেলে প্রতি বছর জামেয়ায় এলে কোন লাভ হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি পাঠ করা হয়, যেখানে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর আত্মত্যাগ এবং বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এবং বোঝানো হয়েছে যে,সব থেকে বড় বিষয় হল বিশ্বস্ততা। কুরআন করীমে বলা হয়েছে, 'ইব্রাহিম আল্লাযী ওয়াফফা'। ইব্রাহিম সেই ব্যক্তি ছিল যে বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছিল। বিশ্বস্ততা কি? বিশ্বস্ততা হল নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করা। বর্তমান যুগে খোদা তা'লার এত বড় পুরস্কার, যেমনটি বলেছি, প্রাচীন যুগে এমন কোন সুবিধা ছিল না, পানি, বিদ্যুত ব্যবস্থা, বৈদুতিন পাখা, শীতকালে ঘর রাখার ব্যবস্থা- এসব কিছুই ছিল না-শীত হলে কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাতে হত আর গ্রীষ্মকালে পানি যেমনই পাওয়া যাক সেটাই নেয়ামত মনে হত। বর্তমান যুগে এত কিছু আছে আমাদের জন্য। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বস্ততার দাবি হিসেবে এই সব নেয়ামত নিয়ে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।আর আহমদীদেরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সব থেকে এগিয়ে থাকা উচিত। আর ওয়াকফীনে নওদের জন্য বিশ্বস্ততা রক্ষার অর্থ হল প্রথমত আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা, তাঁকে কখনও না ভুলা। এরপর যে উদ্দেশ্য নিয়ে মা-বাব ওয়াকফ করেছেন, সেই উদ্দেশ্যকে সব সময় স্মরণ রাখা। এই পৃথিবীতে থেকে এখান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ বিলাস দেখে ভুলে যেও না যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের কিছু অঙ্গীকার রয়েছে, সেগুলির প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে হবে। বরং যা কিছু সুযোগ সুবিধা তোমরা উপভোগ করছ- লেখাপড়া যদি ভাল স্কুলে করছ, শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছ, তবে জগতের মোহে আকৃষ্ট না হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ধর্মের প্রতি আরও বেশি ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া উচিত। ওয়াকফীনে নওদের জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিশ্বস্ততা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর যে নযম পড়া হয়েছে তাতে তিনি বলেছেন, যুগের পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। তিনি অন্য একটি নযমে বলেছেন- 'জিধর দেখো আবরে গুনাহ ছা রাহা হ্যায়/ গুনাহোঁ মেঁ ছোটা বড়া মুবতলা হ্যায়।'

অর্থাৎ-যেদিকে তাকাও পাপের মেঘ ছেয়ে যাচ্ছে/ ছোট বড় সকলেই পাপে লিপ্ত।

পৃথিবী অনেক বেশি পাপে নিমজ্জিত, মিডিয়া, ইন্টারনেট, টিভি অনুষ্ঠান, চ্যাটিং, ওয়েবসাইটস, ফেসবুক এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে, যেগুলিতে পুণ্যের শিক্ষা কম আর পাপের শিক্ষা বেশি থাকে। এগুলি থেকে নিজেদেরও রক্ষা করতে হবে আর অন্যদেরকেও রক্ষা করা ওয়াকফীনে নওদের কাজ। হযরত মুসলে মওউদ (রা.) বলেন, দীর্ঘকাল থেকে শয়তানের রাজত্ব চলছে। যারা আহমদী, যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করেছে, তাদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করা এবং নিজেদেরকেও রক্ষা করা ওয়াকফীনে নওদের কাজ। এটা অনেক বড় কাজ এবং অনেক দায়িত্বের কাজ যা ওয়াফকীনে নওদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। এছাড়া ওয়াকফীনে নওদের জন্য যে অন্যান্য বিষয়গুলি রয়েছে তার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক ওয়াকফে নও-এর এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, আমি আল্লাহ তা'লার প্রতি সব সময় বিশ্বস্ততা রক্ষা করব আর সেটা হল এই যে, আল্লাহ্ তা'লা যে উদ্দেশ্যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা,কখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামায ত্যাগ না করা।আমার সামনে যতজন বাচ্চা বসে আছে, তাদের বয়স দশ বছরের বেশি। সব থেকে ছোট বাচ্চাটার বয়সও দশ বছরের বেশি। আর দশ বছর সেই বয়স যখন নামায ফরয হয়ে যায়, কোন ছাড় থাকে না। বরং দশ বছরের পর কঠোরতা করার নির্দেশ আছে। এক দুই বছর পর্যন্ত মা-বাবা তাদেরকে দু-এক চড় মেরেও দিতে পারে নামায না পড়ার কারণে। এটা তোমদের সহ্য করতে হবে। আর যারা যৌবনে পা দিয়েছে, তাদের নিজেদের এ বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত। বারো বছরের উর্দ্ধে যারা রয়েছে, তাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়া আবশ্যক। এখন শীতকাল, স্কুলে গেলে সময় না পাওয়া গেলে,স্কুল কর্তৃপক্ষকে বল,একটা-দেড়টার সময় যে বিরতি থাকে, সেই সময় তাদের নামায পড়ার সুযোগ দিতে।

স্কুলে দুটি নামায জমা করে পড়ে নিবে। কেননা সাড়ে তিনটে বা পৌনে চারটার পর নামাযের জন্য আর সময়ই থাকে না। তাই কখনও নামায ত্যাগ করবে না। পাঁচ ওয়াক্তের নামায পুরো পড়বে। বিশ্বস্ততা রক্ষার বিষয়ে অন্যান্য দাবিগুলি হল ধর্মে জ্ঞান অর্জন করা আর ধর্মের জ্ঞান পাওয়া যায় কুরআন মজীদ পাঠ করলে। যারা বড় হয়ে গেছ, তারা সব সময় মনে রাখবে যে, কুরআন করীম তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের হওয়া উচিত না। কমপক্ষে এক রুকু প্রতিদিন তিলাওয়াত করবে। অল্পক্ষণের জন্য হলেও তিলাওয়াত করবে। বিশ্বস্ততা রক্ষার আরেকটি দাবি হল আল্লাহ্ তা'লা যে হযরত মসীহ মওউদ(আ.)কে প্রেরণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন- সকল জাগতিক সম্পর্কের চায়তে আমার সঙ্গে বেশি মজবুত ভালবাসার সম্পর্ক তৈরী কর। এর উপায় হল তাঁর বই-পুস্তকাবলী পাঠ কর। যে সব বইয়ের জার্মান ভাষায় অনুবাদ হয়েছে সেগুলি পড়। যেগুলির অনুবাদ হয় নি, মা-বাবাকে বল তারা তোমাদের পড়ে শোনাবেন। তোমাদের পাশাপাশি মা-বাবাদেরও পড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরী হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন- হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই ব্যক্তি যাঁর উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হত আর তাঁর বই পত্রগুলি ফিরিশতাদের পথনির্দেশনায় লেখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার দিকনির্দেশনায় সেগুলি সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর প্রতি ফিরিশতা অবতীর্ণ হত আর যারা সেই বইগুলি পড়ে, গভীর মনোযোগ দিয়ে, তাদের প্রতিও ফিরিশতা অবতীর্ণ হতে শুরু করে। অর্থাৎ সেই সব পুণ্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পুস্তকের যে প্রভাব রয়েছে তা অন্য কোন পুস্তকে নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা বড় হয়ে গেছেন। ১৫,১৬,১৮ বছর বয়স এখন আপনাদের। ওয়াকফে নওদের পাঠ্যক্রম শেষ করে ফেলা, আর তাতেও কেবল ৫০শতাংশ ওয়াকফীনদের ৫০ শতাংশ পাঠ্যক্রম শেষ করা কোন কৃতিত্বের বিষয় নয়। আপনাদের প্রত্যেকেরই একশ ভাগ পাঠ্যক্রম শেষ করা উচিত। আর এটা সাধারণ একটা কোর্স। এটা ছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বই পুস্তক পড়ুন। কুরআন করীমের ব্যাখ্যা রয়েছে। যারা ইংরেজি জানে, তারা ইংরেজিতে ৫টি খণ্ড কুরআনের

এরপর শেষের পাতায়..

জুমআর খুতবা

প্রথম বার যখন স্ফুলিঙ্গ বের হয় তখন আমাকে হীরা এবং কিসরা অর্থাৎ পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে আর জিবরাঈল আমাকে বলেছেন যে, আপনার উম্মত এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে। দ্বিতীয়বারের স্ফুলিঙ্গের সাথে আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল রঙের প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে এবং জিবরাঈল আমাকে অবহিত করেছেন যে, আপনার উম্মত এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করবে। আরতৃতীয়বার যখন আলোর ঝলকানি বের হয় তখন আমাকে সানা-র প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে আর জিবরাঈল আমাকে বলেছেন যে, আপনার উম্মত এগুলোর ওপরও কর্তৃত্ব লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের জন্য সুসংবাদ।

পরিখা খননের কাজে আঁ হযরত (সা.)-এর অংশগ্রহণ এবং আঁ হযরত (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে সাহাবারা নিজেদের দুঃখ-কষ্ট ও ক্লান্তি ভুলে যেতেন।

আহযাবের যুদ্ধের জন্য পরিখা খননের সময় অলৌকিক নিদর্শনের বর্ণনা ।

আহমদীদের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য এবং বিশ্বের সামগ্রিক পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান।

আল্লাহ্ তা'লা সকল শক্তির অধিকারী। যদি এই লোকেরা এখনও সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এসব বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, তাদের যেন বিবেক বুদ্ধির উদয় হয়।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (১৩ তবুক, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আহযাবের যুদ্ধের বরাতে গত খুতবায় আলোচনা হচ্ছিল যে, কীভাবে খায়বারের ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্বেষের ফলশ্রুতিতে কাফেরদের একটি সেনাদল গঠিত হয়, যাতে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে ধ্বংস করা যায়। এর আরও বিশদ বিবরণ ইতিহাসে এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) সুলাইত ও সুফিয়ান বিন অওফ আসলামী (রা.)-কে সেনাদলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলে তার উভয়ে যান। তারা যখন 'বায়যা' নামক স্থানে পৌঁছেন, 'বায়যা' মক্কা এবং মদিনার মাঝখানে 'যুল হুলায়ফা' থেকে (কিছুটা) এগোলে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর। আর 'যুল হুলায়ফা' মদিনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাহোক, তাদের দুজনের প্রতি আবু সুফিয়ানের অশ্বারোহীদের দৃষ্টি পড়ে, শত্রুরা তাদেরকে দেখতে পায়, এরপর তারা উভয়ে লড়াই করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। তাদের উভয়কে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসা হয় এবং একই কবরে (তাদেরকে) সমাহিত করা হয়। লেখা আছে যে, যখন পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন মহানবী (সা.) নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং তাঁর (সা.) সাথে কয়েকজন মুহাজের এবং আনসারও ছিলেন। তিনি (সা.) সেনাবাহিনীর শিবির স্থাপনের জন্য একটি জায়গার সন্ধান করেন তখন তাঁর দৃষ্টিতে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান মনে হয়, সালাহ্ পর্বতকে নিজের পেছনের দিকে রেখে মাযায থেকে যুবাব এবং রাতেজ পর্যন্ত পরিখা খনন করা। মাযায ছিল মদিনায় সালাহ্ পর্বতের নিকটবর্তী একটি স্থান এবং যুবাব ছিল মদিনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। রাতেজ মদিনার দুর্গগুলোর মধ্য হতে একটি দুর্গ, (আর) এটি ইহুদিদের দুর্গ ছিল। এটিও কথিত আছে যে, যুবাবের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ছোট্ট পাহাড় ছিল (রাতেজ)। কাজেই, সেদিন পরিখা খননের কাজ আরম্ভ হয় এবং মুসলমানরা বনু কুরাইযার কাছ থেকে খননের জন্য অনেক সরঞ্জাম যেমন কোদাল, বড় কুঠার, বেলচা প্রভৃতি ধার নেয় এবং মহানবী (সা.) পরিখার প্র ত্যেক দিকের খননের কাজ একটি গোত্রের প্র তি অর্পণ করেন। তিনি (সা.) সাহাবীদের দশজন করে এক একটি দলে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক দশজনের জন্য প্রায় চল্লিশ গজ অংশ নির্ধারণ করেন। মহানবী (সা.) নিজেও খননকাজে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজের পিঠে করে মাটি বহন করেন, এমনকি তাঁর পিঠ ও পেট ধূলোমলিন হয়ে যেত। যেসব মুসলমান নিজেদের কাজ (আগেভাগে) শেষ করে ফেলতেন তারা অন্যদের সাহায্যের জন্য পৌঁছে যেতেন, এভাবে পরিখা খনন সম্পন্ন হয়। এমন নয় যে, কারো কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা বসে পড়তেন, বরং নিজেদের সাথীদের সাহায্যের জন্য পৌঁছে যেতেন। পরিখা খননের কাজে কোনো মুসলমান পিছিয়ে ছিলেন না আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) যখন কেনো ঝুড়ি না পেতেন তখন দ্রুত নিজেদের কাপড়ে করে মাটি বহন করতেন। যে চাদর সামনে পেতেন তাতেই মাটি তুলে নিয়ে যেতেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৩৬৪-৩৬৫) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ১০৫ ,১২৫ ,১২৯ ,২৬৫) (খুলাসাতুল ওয়াফা আখবার দারুল মুসতফা, পৃ: ৫৫৩-৫৫৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এর বিশদ বিবরণ বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, এত বিশাল সৈন্যদলের গতিবিধি গোপন রাখা কাফেরদের জন্য কঠিন ছিল। অধিকন্তু মহানবী (সা.)-এর গোয়েন্দা ব্যবস্থাও অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। তাই, কুরাইশ সেনাবাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা করার সাথে সাথেই মহানবী (সা.) তাদের সম্পর্কে অবগত হন। তখন তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে জড়ো করে এ সম্পর্কে পরামর্শ করেন। এ পরামর্শে ইরানের এক নিষ্ঠাবান সাহাবী সালমান ফাসীও অংশ নিয়েছিলেন। যেহেতু সালমান ফাসী অনারব যুদ্ধরীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন অর্থাৎ, অনারবদের রণকৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তিনি (রা.) এই পরামর্শ প্রদান করেন যে, মদিনার অরক্ষিত অংশের সম্মু খে একটি দীর্ঘ ও গভীর পরিখা খনন করে নিজেদের সুরক্ষিত করা হোক। পরিখার ধারণা আরবদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে অবগত হয়ে যে, এই রণকৌশল অনরাবদের মাঝে সাধারণ্যে সফলতার সাথে প্রচলিত আছে, মহানবী (সা.) এই পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করেন।"

গত খুতবায়ও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তাঁকে (সা.) আল্লাহ্ তা'লাও জানিয়েছিলেন যে, এটি সঠিক পদ্ধতি। যাহোক, লেখা আছে যে, যেহেতু মদিনা শহরের তিন দিক যথেষ্ঠ নিরাপদ ছিল, অর্থাৎ বাড়িঘরের অবিচ্ছিন্ন প্রাচীর এবং ঘন গাছপালা ও পাথরের শৃঙ্খল থাকার কারণে এই অংশগুলো কাফের সেনাদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল। কেবলমাত্র সিরিয়া (অভিমুখী) দিকটি-ই এমন ছিল, যেদিক দিয়ে শত্রুরা দলবদ্ধ হয়ে মদিনায় আক্রমণ করতে পারতো। তাই মহানবী (সা.) এই অরক্ষিত অংশে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন এবং মহানবী (সা.) তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করে বণ্টনরীতি অনুযায়ী পরিখাকে দশ হাত করে অর্থাৎ, ১৫ ফুট করে এক একটি অংশে বিভক্ত করে, একেকটি

অংশ দশজন সাহাবীর ওপর ন্যস্ত করেন। এই দলগুলো বিভাজনের ক্ষেত্রে এক প্রীতিপূর্ণ মতানৈক্য দেখা দেয় যে, সালমান ফাসী কোন্ দলে গণ্য হবেন। প্রত্যেক দলই সালমান ফাসীকে তাদের দলে নিতে চাইত। অর্থাৎ, তাঁকে কি মুহাজের গণ্য করা হবে, নাকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ই তিনি মদিনায় চলে এসেছিলেন বিধায় তিনি আনসার বলে গণ্য হবেন? যেহেতু সালমান ফাসী (রা.) এই রণকৌশলের প্রবর্তক ছিলেন আর তিনি বার্ধক্য সত্ত্বেও একজন সক্রিয় ও শক্তিশালী মানুষ ছিলেন, তাই প্র ত্যেক পক্ষই তাকে নিজেদের দলে নিতে চাচ্ছিল। অবশেষে এই মতানৈক্যের কথা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হলে তিনি (সা.) উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনেন। অর্থাৎ, উভয়পক্ষ যে দাবি করেছিল তা তিনি (সা.) শোনেন, এরপর মুচকি হেসে বলেন, সালমান তোমাদের কারো মধ্য হতেই নয়। না সে মুহাজেরদের মধ্য হতে আর না-ই আনসারের মধ্য হতে, বরং 'সালমানু মিন্না আহলাল বায়ত'- অর্থাৎ, সালমান আমার আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। সে সময় থেকে হযরত সালমান ফাসী (রা.)-র এই সৌভাগ্য অর্জিত হয় যে, তাঁকে যেন মহানবী (সা.)-এর পরিবারের সদস্য জ্ঞান করা আরম্ভ হয়।

যাইহোক, পরিখা খননের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পর সাহাবীদের দল শ্রমিকদের পোশাক পরিধান করে কর্ম ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। খননের কাজ এতটা সহজ কাজ ছিল না, অনেক কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। উপরন্তু শীতের মৌসুম ছিল। যে কারণে সেই দিনগুলোতে সাহাবীদেরকে চরম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। আর যেহেতু অন্যান্য কাজকর্ম ও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল, তাই যারা দিনমজুর ছিলেন, সাহাবীদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। অর্থাৎ, দিনমজুর ছিলেন এবং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়েই তাদের প্রাত্যহিক খাবার জুটতো; তাদেরকে তো সেই দিনগুলোতে ক্ষুধা এবং অনাহারের কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। আর যেহেতু সাহাবীদের নিকট চাকর এবং ক্রীতদাসও ছিল না, এজন্য প্রত্যেক সাহাবীকে স্বহস্তেই নিজের কাজ করতে হতো। দশজন করে যেসব দল গঠন করা হয়েছিল তারা তাদের কাজকে নিজেদের মাঝে এভাবে বণ্টন করেছিলেন যে, কিছু লোক খনন করতো আর কিছু লোক খননকৃত মাটি ও পাথর ঝুড়িতে বোঝাই করে নিজের কাঁধে বহন করে বাইরে ফেলে আসতেন। মহানবী (সা.)ও তাঁর অধিকাংশ সময় পরিখার পাশেই অতিবাহিত করতেন এবং কখনো কখনো স্বয়ং সাহাবীদের সাথে মিলে খনন ও মাটি বহনের কাজ করতেন।" (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৭৪-৫৭৫)

পরিখা খননের সময় মানুষকে উজ্জীবিত রাখার জন্য পঙক্তিও পাঠ করা হতো। এর বিশদ বিবরণে লেখা আছে যে, হযরত সাহ্ল বিন সা'দ (রা.) ও হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন আমাদের নিকট আগমন করেন তখন আমরা পরিখা খনন করছিলাম এবং নিজেদের কাঁধে করে মাটি স্থানান্তর করছিলাম। যখন তিনি (সা.) আমাদের এই কঠোর পরিশ্রম ও ক্ষুধার তাড়না দেখেন তখন বলেন,

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهْ
فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

(উচ্চারণ: "আল্লাহুম্মা লা আইশা ইল্লা আইশাল্ আখিরা ... ফাগফিরিল আনসারাওয়াল মুহাজিরা")

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! পারলৌকিক বিলাসিতাই প্রকৃত বিলাসিতা। অতএব, তুমি আনসার ও মুহাজেরদের ক্ষমা করে দাও। তখন সাহাবীরা মহানবী (সা.)-কে প্রত্যুত্তরে বলেন,

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدَا
عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا

(উচ্চারণ: "নাহনুল্লাযী বাইয়ায়ু মুহাম্মাদা...আলাল্ জিহাদে মা বাকীনা আবাদা") অর্থাৎ, আমরা সেই দল যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে আমৃত্যু জিহাদের শর্তে বয়আত করেছি।

হযরত বারা বিন আযেব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমি আল্লাহ্র রসূল (সা.)-কে মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি তাঁর (সা.) পবিত্র উদরের শুভ্রতা মাটিতে ঢাকা পড়ে যায়। আমি তাঁকে (সা.) ইবনে রওয়াহা-র এই পঙক্তি পাঠ করতে শুনেছি যে,

وَاللهِ لَوْلَا مَا اهْتَدَيْنَا
وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا
وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقِيْنَا
وَالْمُشْرِكُوْنَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا
إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا

(উচ্চারণ: "ওয়াল্লাহে লাও লা মাহ্তাদাইনা, ওয়া লা তাসাদ্দাকনা, ওয়া লা সাল্লাইনা। ফাআনযিলান সাকিনাতান আলাইনা, ওয়া সাব্বিতিল আকদামা ইন লাকীনা। ওয়াল মুশরেকূনা ক্বাদ বাগাউ আলাইনা, ইযা আরাদূ ফিতনাতান আবাইনা।")

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু! যদি তোমার অনুগ্রহ না হতো তাহলে আমরা হেদায়েত পেতাম না। আর আমরা দান-সদকা করার আর তোমার ইবাদত করার যোগ্য হতে পারতাম না। অতএব হে খোদা! তুমি যেহেতু আমাদের এই পর্যায়ে উপনীত করেছো অতএব এখন এই বিপদের সময় আমাদের হৃদয়ে প্রশান্তি দান করো। আর যদি শত্রুর সাথে মোকাবিলা হয় তাহলে আমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখো। তুমি জানো যে, এরা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে আক্রমণ করছে আর তাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে নিজেদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা। কিন্তু হে আমাদের খোদা! তোমার কৃপায় আমদের অবস্থা হলো এই যে, যখন তারা আমাদেরকে ধর্মবিচ্যুত করার জন্য কোনো অপচেষ্টা করে তখন আমরা তাদের অপচেষ্টাকে দূর হতেই প্রত্যাখ্যান করি। আর তাদের নৈরাজ্যের শিকার হতে অস্বীকার করি। আর তিনি (সা.) আবাইনা, আবাইনা শব্দ উচ্চস্ব রে বলতেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, পঙক্তির শেষে শব্দকে দীর্ঘায়িত করতেন।

যাইহোক পরিখার খননকাজ একটি পরিশ্রমসাধ্য কাজ ছিল। আর অন্যান্য সাহাবীর সাথে আল্লাহ্র রসূল (সা.)-ও পরিখা খননে অংশ নিয়েছেন। কখনো তিনি কোদাল চালাতেন আর কখনো বেলচা দিয়ে মাটি জড়ো করতেন। আবার কখনো ঝুড়িতে করে মাটি উঠাতেন। একদিন তিনি (সা.) অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি বসে পড়েন। এরপর তিনি তাঁর বামপাশে পাথরে হেলান দেন এবং তাঁর ঘুম চলে আসে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) তাঁর (সা.) শিয়রে দাঁড়িয়ে মানুষকে তাঁর পাশ দিয়ে যেতে বারণ করতে থাকেন যেন কোথাও তারা মহানবী (সা.)-কে জাগিয়ে না দেয়। কিছুক্ষণ পর তিনি (সা.) যখন জাগ্রত হন তখন দ্রুত উঠে বসেন এবং বলেন, তোমরা আমাকে জাগাওনি কেন। আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম, আমাকে জাগাওনি কেন। এরপর তিনি (সা.) বড় কোদাল নিয়ে মাটিতে আঘাত করা আরম্ভ করেন, অর্থাৎ কাজ আরম্ভ করে দেন। মহানবী (সা.)-এর অংশগ্রহণ ও তাঁর দোয়ার কল্যাণে সাহাবীরা তো যেন নিজেদের দুঃখ-বেদনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কষ্ট ভুলেই যেতেন। আর যেখানে একদিকে পবিত্র কবিতা আবৃত্তি হতো সেখানে অপরদিকে অল্প সল্প রসিকতাও চলত। যেমন, একবার হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), যিনি কম বয়সী যুবক ছিলেন, পরিখা খনন করতে করতে পরিখার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লে তার এক বন্ধু তামাশাচ্ছলে তার খননযন্ত্র উঠিয়ে নেয়। তিনি জাগ্রত হয়ে নিজের সামগ্রী না পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। তার এই অস্থিরতা দেখে অন্য বন্ধুরা আনন্দ উপভোগ করতে থাকে। মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন তখন তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-কে বলেন, হে ছেলে! তুমি এমনভাবে ঘুমিয়েছো যে, নিজের সামগ্রীরও কোনো খবর রাখোনি। এক বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত যায়েদের কাছে এসে মুচকি হেসে বলেন, 'ইয়া আবা রুকাদ' অর্থাৎ, হে নিদ্রার জননী! যদিও একইসাথে তিনি (সা.) প্রজ্ঞার মাধ্যমে এরূপ হাসি-তামাশার সংশোধনও করেন এবং বলেন, যায়েদের সামগ্রীর খবর কি কেউ জানে? তখন এক ব্যক্তি নিবেদন করে, হুযূর! তার সামগ্রী আমার কাছে আছে আর আমিই নিয়েছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, কোনো মুসলমানকে এভাবে বিরক্ত করা উচিত নয় যে, তার অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি (অগোচরে) উঠিয়ে নেওয়া হবে।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড,পৃ: ৪২০) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৫-৩৬৭) (ইমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৭)

সাহাবীদের অবিশ্রান্ত দিবা-রাত্রির পরিশ্রম এবং মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে এই পরিখা খনন সম্পূর্ণ হয়। মুসলমানরা পরিখা খনন করে তা মজবুত করে দেয়। পরিখা খনন কতদিনে সমাপ্ত হয়েছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে যে, ছয় দিন, দশ দিন, পনেরো দিন, বিশ দিন এবং এক মাস। উক্ত সময়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। পনেরো দিন এবং এক মাস সম্পর্কে অধিক ঐকমত্য পোষণ করা হয়।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২২)

এই পরিখার দৈর্ঘ্য আনুমানিক ছয় হাজার গজ অথবা প্রায় সাড়ে তিন মাইল ছিল, প্রশস্ততা নয় হাত এবং গভীরতা সাত হাত ছিল। এক হাত সমান দেড় ফুট বলা হয়ে থাকে। সেই হিসেবে প্রশস্ততা তেরো-চৌদ্দ ফুট এবং গভীরতা দশ-এগারো ফুট হয়।

(এটলাস সীরাত নববী,পৃ: ২৭৮) (গাযওয়ায়ে আহযাব, পৃ:১৭১) (আসসহীহ মিন সীরাতন নবী আল আযাম, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২০৮)

এই দীর্ঘ ও প্র শস্ত পরিখা শতাব্দী কাল ব্যাপী দৃশ্যমান ছিল। অবশেষে বাতহান উপত্যকার পানির অবিরাম প্রবাহ এবং ক্ষয়ের কারণে সেটি ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। বাতহান হলো মদিনার তিনটি বিখ্যাত উপত্যকার মাঝে একটিউপত্যকা। অপর দুটি উপত্যকা হলো আকীক ও কানাহ্ উপত্যকা।

(ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৫৮-৫৯)

এই পরিখার কিছু অংশ মানুষ ভরাট করেছিল যেন এপার-ওপার যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়। আর অবশিষ্টাংশ বাতহান উপত্যকার নালার পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। পলি বলা হয় নদীর স্রোত বা বৃষ্টির পানির সাথে আনীত নরম মাটি যা স্তরীভূত হয়। এই (পলিমাটি) দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। ষষ্ঠ হিজরী

শতাব্দীর প্রখ্যাত মদিনার ইতিহাসবিদ হাফেজ ইবনে নাজ্জার লিখেন, পরিখার বিষয়টি হলো, আজও আমাদের যুগে সেটি দৃশ্যমান আছে, যদিও তা একটি নালার আকৃতি ধারণ করেছে। এর দেয়াল অধিকাংশ স্থানে বিলীন হয়ে গেছে এবং বহু সংখ্যক খেজুরের গাছ এর ভিতর গজিয়েছে। নবম হিজরী শতাব্দীর একজন লেখক লিখেন, বর্তমানে এই পরিখার কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ, ছয়শ বছর পর্যন্ত এটি দৃশ্যমান ছিল। নবম শতাব্দীতে তিনি বলেন, কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই কেবল এতটুকু ব্যতিরেকে যে, এর অবস্থানস্থল সেই নদীর মাধ্যমে জানা যায় যা বাতহান উপত্যকার অংশ এবং এর স্থানে প্রবাহিত হচ্ছে।

(জুস্তজুয়ে মাদিনা, পৃ: ৪০৫)

লিখিত আছে যে, মদিনায় এই দিনগুলো ভয়ভীতি ও উদ্‌বেগে ভরা থাকলেও মুনাফেকরা নানান অজুহাতে নিজেদের বাড়িঘর ও শিবিরে ফিরে যেতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সাহাবীদের সামগ্রিক উত্তেজনা ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। শিশু এবং নারীরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের সাহস যোগানো এবং তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকেও এই বিপদের মুহূর্তে দৃ ঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে মহানবী (সা.)-এর পাশে দণ্ডায়মান দেখা যায়। পরিখা যেহেতু মদিনার বাইরে খনন করা হচ্ছিল আর মহানবী (সা.) বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকতেন এবং মদিনার নারী ও শিশুদের মদিনার কয়েকটি শক্তিশালী দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তাই মাঝে মাঝে হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে যেতেন ও কয়েকদিন থাকতেন। তারপর হযরত উম্মে সালামা কয়েকদিন থাকতেন। এরপর হযরত যয়নব কয়েকদিন থাকতেন। আর অন্য সব পবিত্র স্ত্রীরা বনু হারেসার মজবুত দুর্গে ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, পবিত্র স্ত্রীরা বনু যুরায়েক-এর নাসর দুর্গে ছিলেন। আরও বলা হয়েছে যে, কয়েকজন স্ত্রী ফারে-তে ছিলেন। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। ফারে হলো মদিনায় হযরত হাসসান বিন সাবেত-এর দুর্গ।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৭) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২২৩)

পরিখা খননের সময় কিছু অলৌকিক ঘটনাও ঘটেছে, তার মধ্যে খননকালে পাথর না ভাঙার ঘটনাও বর্ণনা করা হয়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, পরিখা খননের সময় একটি শক্ত এবং পাথুরে স্থান আসে আর সাহাবীদের কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে স্থান খননে তারা অপারগ হয়ে পড়েন। অবশেষে তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন জানান। তিনি (সা.) একটি কোদাল নিয়ে সেই জায়গায় আঘাত করেন এবং সেই পাথুরে মাটি বালির মতো ঝুরঝুরে হয়ে যায়। একটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) সামান্য পানি আনান এবং তাতে নিজ মুখের লালা মিশিয়ে দেন। তারপর তিনি আল্লাহ্‌তা'লার কাছে প্রার্থনা করেন। আর এরপর তিনি সেই পাথুরে মাটিতে এই পানি ছিটিয়ে দেন। তখন সেখানে উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে কতক সাহাবী বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি মহানবী (সা.)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এই পানি পড়তেই সেই জমি নরম হয়ে বালির ন্যায় হয়ে যায়।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২০)

সেটি দ্বিতীয় ঘটনা যেখানে রাজত্বের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল আর দ্বিতীয় ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, (প্রথম ঘটনাটি ছিল পানি ছিটানোর ঘটনা।) আর যেটিতে তাঁকে (সা.) ভবিষ্যৎ রাজত্বের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে অন্য একটি স্থানে উল্লেখ আছে যে, হযরত সালমান ফাসী একটি পাথর ভাঙতে পারছিলেন না। তখন মহানবী (সা.) হযরত সালমানের কাছ থেকে কোদাল নিয়ে নেন। অর্থাৎ হযরত সালমান ফাসীর দ্বারা একটি পাথর ভাঙছে না দেখে মহানবী (সা.) তার হাত থেকে কোদাল নিয়ে সেটির ওপর একটি আঘাত করেন, ফলে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটি ঝলকানি দেখা যায়। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহু আকবার। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাহাবীরাও আল্লাহু আকবার বলেন এবং এর একটি অংশ ভেঙে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) দ্বিতীয়বার আঘাত করেন এবং তা থেকে একটি ঝলকানি বের হয়। মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহু আকবার। এরপর পাথরের আরও কিছু অংশ ভেঙে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) তৃতীয়বার আঘাত করেন এবং অবশিষ্ট পাথরটিও ভেঙে যায় আর সেখান থেকে আবারও আলোর ঝলকানি বের হয়। তখনও মহানবী (সা.) আল্লাহু আকবার বলেন। সাহাবীরাও প্রতিবার আল্লাহু আকবার বলেন। হযরত সালমান ফাসী, যিনি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যখন কোদাল দিয়ে আঘাত করতেন তখন পাথর থেকে একটি আলো দেখা দিত এবং আপনি আল্লাহু আকবার বলতেন। এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, হে সালমান! তুমিও কি আলো দেখেছো? তিনি নিবেদন করেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমিও দেখেছি। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, প্রথম বার যখন স্ফুলিঙ্গ বের হয় তখন আমাকে হীরা এবং কিসরা অর্থাৎ পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে আর জিবরাঈল আমাকে বলেছেন যে, আপনার উম্মত এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে। দ্বিতীয়বারের স্ফুলিঙ্গের সাথে আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল রঙের প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে এবং জিবরাঈল আমাকে অবহিত করেছেন যে, আপনার উম্মত এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করবে। আরতৃতীয়বার যখন আলোর ঝলকানি বের হয় তখন আমাকে সানা-র প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে আর জিবরাঈল আমাকে বলেছেন যে, আপনার উম্মত এগুলোর ওপরও কর্তৃত্ব লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের জন্য সুসংবাদ। একথা শুনে সবাই সমস্বরে বলে উঠল, আলহামদুলিল্লাহ্! এটি একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তা'লা কষ্টের পর আমাদের সাথে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন আর মহানবী (সা.) পারস্যের প্রাসাদসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি সালমান ফাসীকে বলতে থাকেন, তখন সালমান ফাসী (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি সত্য বলেছেন, এগুলোই তার বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন। অর্থাৎ তিনি (সা.) যেভাবে সেই প্রাসাদসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছেন হযরত সালমান ফাসী তার সত্যায়ন করেছেন। তিনি অর্থাৎ হযরত সালমান ফাসী বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্ তা'লার রসূল।

এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে সালমান! এ বিজয়সমূহ আল্লাহ্ তা'লা আমার (মৃত্যুর) পর প্রদান করবেন। সিরিয়া বিজিত হবে এবং হিরাকেল তার রাজত্বের শেষ সীমান্তেপলায়ন করবে আর তোমরা সিরিয়ার ওপর বিজয় লাভ করবে। তোমাদের সাথে কেউ বিবাদ-বিতণ্ডা করবে না। আর এই প্রাচ্যও বিজিত হবে এবং কিসরা নিহত হবে। এরপর আর কোনো কিসরা হবে না। এ কথায় মুনাফেকরা এই বলে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাকে যে, এই বিপদ, অসহায়ত্ব এবং ভয় ও আতঙ্কের পরিস্থিতিতে এরূপ মহান কিন্তু বাহ্যত অসম্ভব সুসংবাদে মু'মিনদের ঈমান যদিও আরও বৃদ্ধি পায় এবং এটি তাদের আত্মতৃপ্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়, কিন্তু মুনাফেকরা এতে ঠাট্টাবিদ্রূপ আরম্ভ করে দেয়। মুনাফেকরা বলে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদেরকে এই সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি ইয়াসরেব (বা মদিনা) থেকে হীরা-র প্রাসাদসমূহ ও রোমান সাম্রাজ্যের শহরসমূহ দেখছেন আর তোমরা তা বিজয় করবে। অথচ তোমরা এখানে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন করছো আর তোমাদের মধ্যে এই শক্তিটুকু ও নেই যে, তোমরা এখান থেকে বের হয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য কিছুটা দূরে যেতে পারো। এই উপলক্ষ্যে মুনাফিকদের এই অবস্থার বহিঃপ্রকাশ আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে করেছেন যেখানে তিনি বলেন, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنٰفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (সূরা আহযাব: ১৩) অর্থাৎ, আর যখন মুনাফিকরা এবং সেসব লোকেরা যাদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে তারা বলেছিল যে, আমাদের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ধোঁকা ছাড়া আর কোনো অঙ্গীকার করেনি। কিন্তু পরবর্তীতে দৃষ্টিবানরা এটি অবলোকন করেছে যে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে এই সমস্ত শহর ও রাজকীয় প্রাসাদসমূহ বিজিত হয়ে যায় আর এই নিঃস্ব, অসহায় ও ক্ষুধার জ্বালায় কাতর মু 'মিনরাই এই সকল প্রাসাদসমূহের উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। হযরত সালমান ফাসী (রা.) বর্ণনা করেন, এই সমস্ত বিজয় আমি দেখেছি।

(আল ইকতিফা,১ম খণ্ড, পৃ: ৪২২) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, পৃ:৩৬৮)

এসব ঘটনাবলী, অর্থাৎ পাথর ভাঙা ও মুজেযা প্রদর্শিত হবার যেসব ঘটনা রয়েছে সেগুলো হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন,নিদারুণ কষ্ট ও চরম পরিস্থিতির অবস্থায় পরিখা খনন করার সময় এক স্থানে একটি পাথর বেরিয়ে আসে যেটিকে কোনোভাবেই ভাঙা সম্ভব হচ্ছিল না আর সাহাবীদের অবস্থা এমন

ছিল যে, তারা লাগাতার তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকার কারণে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তারা নবী করীম (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, একটি পাথর আছে, যা কোনোভাবেই ভাঙা যাচ্ছে না। সে সময় তাঁর (সা.)ও এই অবস্থা ছিল যে, ক্ষুধার তাড়নায় তিনি (সা.) পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন, এতদসত্ত্বেও তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন আর একটি কোদাল নিয়ে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে সেই পাথরের ওপর আঘাত করেন। লোহা পাথরে আঘাত করতেই পাথরের মধ্যে হতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এর ফলে তিনি (সা.) উচ্চৈস্ব রে আল্লাহু আকবার ধ্বনিউচ্চকিত করেন এবং বলেন, আমাকে সিরিয়া সাম্রাজ্যের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে আর খোদার কসম! এখনই সিরিয়ার লাল দুর্গগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এভাবে আঘাতের ফলে সেই পাথরটি অনেকটা আলগা হয়ে যায়। এরপর তিনি পুনরায় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন। এবারও অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ফলে তিনি (সা.) পুনরায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন এবং বলেন, এবার আমাকে পারস্যের রাজত্ব প্রদান করা হয়েছে আর মিদিয়ানের শুভ্র প্রাসাদসমূহ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এই আঘাতের পর পাথরটি আরও কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) তৃতীয়বার পাথরের ওপর কোদাল দ্বারা আঘাত করেন। পুনরায় এক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। এবারও তিনি (সা.) আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন। তিনি (সা.) বলেন, এবার আমাকে ইয়েমেনের রাজত্ব প্রদান করা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র কসম! সানার দরজাগুলো আমাকে এই মুহূর্তে দেখানো হচ্ছে। এবার সেই পাথরটি পুরোপুরি ভেঙে গিয়ে স্বস্থান থেকে খসে পড়ে। অপর এক বর্ণনায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে; মহানবী (সা.) প্র ত্যেকবার উচ্চস্বরে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করেন আর পরবর্তীতে সাহাবীদের প্রশ্নে র উত্তরে তিনি (সা.) উক্ত কাশফ বর্ণনা করেন। আর মুসলমানগণ এই সাময়িক বাধা অতিক্রম করে পুনরায় নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করে। মহানবী (সা.)-এর এসব দৃশ্য দিব্যদর্শনের জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।অর্থাৎ যেন সেই অভাবের যুগে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বিজয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের দৃশ্যাবলি প্রদর্শন করে সাহাবীদের মাঝে আশা ও বিস্তৃতির স্পৃহা সঞ্চার করেন। কিন্তু বাহ্যতএ সময়টি এত কঠিন ও কষ্টকর ছিল যে, মদিনার মুনাফেকেরা এসব প্রতিশ্রুতির কথা শুনে মুসলমানদের নিয়ে কটাক্ষ করতে থাকে যে, ঘরের বাইরে পা রাখার যোগ্যতা নেই, অথচসিরিয়া ও পারস্য বিজয়ের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে! কিন্তু খোদার দরবারে এসব পুরস্কার মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, এই অঙ্গীকারসমূহ যথাসময়ে, অর্থাৎ কিছু মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ দিকে আর অধিকাংশ তাঁর (সা.) খলীফাদের যুগে পূর্ণতা লাভ করে মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি ও পূর্ণতার কারণ হয়।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৭৭-৫৭৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ বিষয়ে লিখেছেন। তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল, তখন মাটির ভেতর থেকে এমন একটি পাথর বের হয়, যেটি কারো পক্ষে ভাঙা সম্ভব হচ্ছিল না। সাহাবীরা মহানবী (সা.)-কে এ বিষয়টি অবগত করেন। তিনি (সা.) স্বয়ং সেখানে গমন করেন। তিনি (সা.) কোদাল নিজের হাতে তুলে নেন এবং সজোরে সেই পাথরে আঘাত করেন। কোদালের আঘাতে সেই পাথর থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় এবং তিনি (সা.) বলে ওঠেন, আল্লাহু আকবার। পুনরায় তিনি (সা.) কোদাল দিয়ে আঘাত করেনএবং পুনরায় স্ফুলিঙ্গ নির্গ ত হয়। এবারও তিনি আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন। অতঃপর তৃতীয়বার তিনি কোদাল দিয়ে পাথরে আঘাত করেন। আবারও পাথর থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় এবং সাথে সাথেই পাথরটি ভেঙে যায়। এ সময় তিনি পুনরায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চকিত করেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি কেন উচ্চকিত করলেন? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, পাথরের ওপর কোদাল দিয়ে আঘাত করার ফলে তিনবার যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সেই তিনবারই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলামের ভবিষ্যৎ উন্নতির চিত্র দেখিয়েছেন। প্রথমবারের অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সাথে সিজারের শাসনাধীন সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আমাকে দেখানো হয়েছে এবং এর চাবিগুলো আমাকে প্র দান করা হয়েছে। দ্বিতীয়বারের অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সাথে মিদিয়ানের শুভ্র প্রাসাদসমূহ আমাকে দেখানো হয়েছে এবং পারস্যের চাবিসমূহ আমাকে প্রদান করাহয়েছে। তৃতীয়বারের অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সাথে সানা-র দ্বারসমূহ আমাকে দেখানো হয়েছে এবং ইয়েমেনের সাম্রাজ্যের চাবি আমাকে প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখো। শত্রু তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন,আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৬৯)

সেই দিনগুলোতে যেসব অলৌকিক নিদর্শন ঘটে তার মাঝে খাবার সংক্রান্ত একটি নিদর্শনও রয়েছে। খাবারের আরও নিদর্শন থেকে থাকবে কিন্তু একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) খাবারের আয়োজন করেন এবং তা বরকতমণ্ডিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত জাবের (রা.) সেই দিনগুলোতেইএকদিন লক্ষ্য করেন, মহানবী (সা.) তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন এবং সাহাবীরা তিন দিন ধরে সেখানে আছেন কিন্তু কোনো খাবার চেখে দেখারও সুযোগ পাননি। অর্থাৎ, তিনদিন কেটে গেলেও কোনো খাবার জোটেনি। জাবের (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন। আমি বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে বলি, আমি মহানবী (সা.)-এর চেহারায় তীব্র ক্ষুধার প্রভাব লক্ষ্য করেছি, যা দেখে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারিনি। ঘরে কিছু আছে কি? সে বলে, ঘরে কেবল এক সা পরিমাণ যব অর্থাৎ আড়াই সেরের সামান্য কম পরিমাণ জব আর একটি বকরির বাচ্চা আছে। তখন তার স্ত্রী সেই পাত্রটি বের করেন যাতে যব ছিল আর তিনি (অর্থাৎ জাবের) বলেন যে, আমি বকরির বাচ্চাটি জবাই করি আর আমার স্ত্রী যব পিষে। অতঃপর আমি হাড়িতে মাংস ঢেলে দিই। আমার স্ত্রী বলে, খাবার যেহেতু পরিমাণে অল্প তাই চুপিসারে মহানবী (সা.)-কে বলবে। এমন যেন না হয় যে, আমাকে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের (রা.) সামনে লজ্জিত হতে হবে। অর্থাৎ মানুষ বেশি হবে আর খাবার কম পড়বে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই এবং চুপিসারে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের কাছে সামান্য পরিমাণ খাবার রয়েছে। তাই আপনি আর আপনার সাথে একজন বা দুইজন চলুন। তখন মহানবী (সা.) তাঁর আঙ্গুলগুলো আমার আঙ্গুলে রাখেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কতটুকু আছে? আমি বলি, এতটুকু। মহানবী (সা.) বলেন, এটিই যথেষ্ট এবং উত্তম। তুমি বাড়ি যাও আর নিজ স্ত্রীকে বলবে, আমি আসার পূর্বে হাড়ি যেন চুলা থেকে না নামায় আর রুটি বানানো আরম্ভ না করে। অতঃপর মহানবী (সা.) আহ্বান করেন, হে পরিখা খননকারীরা! জাবের তোমাদের জন্য খাবারের আয়োজন করেছে। সবাই চলে আসো। মহানবী (সা.) সবার সম্মুখে হাঁটা আরম্ভ করেন। আর আমি এত লজ্জা পাচ্ছিলাম যা কেবল আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। আমি মনে মনে বলি, এখানে তো অনেক লোক চলে এসেছে। মাত্র এক সা জব আর একটি বকরির বাচ্চার মাংস দ্বারা এত বেশি লোককে খাবার খাওয়ানো, খোদার কসম, খুবই লজ্জিত হতে হবে! আমি ঘরে ফিরে স্ত্রীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাই যে, মহানবী (সা.) তাঁর সাথে আনসার ও মুহাজেরদের নিয়ে আসছেন। স্ত্রী বলে, তোমার মঙ্গল হোক, আমি তোমাকে চুপিসারে নিবেদন করতে বলেছিলাম। স্বামী স্ত্রীকে জবাবে বলেন, তুমি আমাকে যেভাবে বলেছিলে আমি ঠিক সেভাবেই বলেছি। স্ত্রী বলে, তাহলে বাকি লোকদের তুমি দাওয়াত দিয়েছো নাকি মুহাম্মদ (সা.)? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) দাওয়াত দিয়েছেন। একথা শুনে ঈমান ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ তাঁর (রা.) স্ত্রী বলেন, তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। এখন আর চিন্তার কিছু নেই। এটি হলো সেই নারীর ঈমান যিনি তখন ঈমান ও নিষ্ঠায় তাঁর স্বামীর চেয়েও অগ্রগামী হয়ে গিয়েছিলেন। জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, অতঃপর মহানবী (সা.) আমাদের ঘরে প্রবেশ করেন এবং বলেন, তোমরা দশজন করে ঘরে প্রবেশ করো, অর্থাৎ যারা এসেছিলেন তাদেরকে দশজনের এক একটি দলে ভাগ করে দেন। আর জাবের (রা.)-এর স্ত্রী যখন আটা বের করেন তখন তিনি (সা.) তাতে লালা মিশ্রিত করেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করেন। এরপর আমাদের হাড়িতে লালা মিশিয়ে বরকত সৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। অতঃপর তিনি (সা.) আমাদের বলেন, রুটি বানাও আর তরকারি ঢালো এবং হাড়ি ঢেকে দাও। আবার চুলা (তন্দুর) থেকে রুটি বের করো আর রুটিগুলোও ঢেকে দাও। তখন আমরা তা-ই করি। আমরা তরকারি বের করতাম আর মহানবী (সা.) হাড়ি ঢেকে দিতেন। এরপর পুনরায় তা খুলে দিলে আমরা দেখি যে, তা থেকে কিছুই কমেনি। একইভাবে চুলা থেকে রুটি নামিয়ে তা ঢেকে রাখতেন। তা থেকেও কিছুই কমতো না। তিনি (সা.) রুটি টুকরো করতেন এবং এতে মাংস রাখতেন এবং নিজের সাহাবীদের নিকটে দিয়ে বলতেন, খাও। যখন এক দল তৃপ্তি সহকারে আহার করে চলে যেত তখন অপর দলকে ডাকতেন। এমনকি এক হাজার লোক সেই খাবার গ্রহণ করে এবং সবাই চলে যায়। আর আমাদের হাড়ি পূর্বের ন্যায় ফুটছিল এবং আমাদের আটা পূর্বের ন্যায়ই

পড়ে ছিল। তিনি (সা.) বলেন, এটা তোমরা খাও এবং অন্যদেরও পাঠাও। কেননা, লোকেরা অনেক ক্ষুধার্ত।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৯) (লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ:৬৪৮)

এই ঘটনাটিকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও লিখেছেন। তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে,একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) তাঁর (সা.) চেহারায় ক্ষুধার কারণে দুর্বলতা ও ক্লান্তির লক্ষণ দেখে তাঁর (সা.) কাছে নিজ ঘরে যাওয়ার অনুমতি গ্রহণ করেন। ঘরে এসে তিনি নিজের স্ত্রীকে বলেন, মহানবী (সা.) ক্ষুধার তীব্রতার কারণে ভীষণ কষ্টে আছেন বলে মনে হচ্ছে। তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে? তিনি বলেন, কিছুটা জবের আটা এবং একটি ছাগল আছে। জাবের (রা.) বলেন, তখন আমি ছাগলটি জবাই করি এবং আটা প্রস্তুত করি। এরপর তিনি নিজের স্ত্রীকে বলেন, তুমি খাবার প্রস্তুত করো। আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করছি যেন তিনি আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। আমার স্ত্রী বললো, আমাকে আবার অপমানিত কোরো না। খাবার অল্প, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বেশি লোক যেন না আসে। জাবের বলেন, আমি গিয়ে একান্তে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার কাছে কিছু মাংস এবং জবের আটা আছে, যেগুলো রান্না করার জন্য আমি নিজের স্ত্রীকে বলে এসেছি। আপনি আপনার কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসুন এবং খাবার গ্রহণ করুন। তিনি (সা.) বলেন, কতটুকু খাবার আছে? আমি নিবেদন করলাম, এই এই পরিমাণ আছে। তিনি (সা.) বলেন, যথেষ্ট আছে। এরপর তিনি (সা.) নিজের আশেপাশে দৃষ্টি দিয়ে উচ্চৈস্বরে বলেন, হে আনসার ও মুহাজেরদের দল! জাবের আমাদের দাওয়াত করেছে, চলো গিয়ে খেয়ে আসো। এই ডাকে প্রায় এক হাজার ক্ষুধার্ত সাহাবী তাঁর সাথে রওয়ানা হন। তিনি (সা.) জাবের (রা.)-কে বলেন, তুমি দ্রুত যাও এবং নিজের স্ত্রীকে বলো, আমার না আসা পর্যন্ত হাড়ি যেন চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি বানানো আরম্ভ না করে। জাবের দ্রুত গিয়ে নিজের স্ত্রীকে সংবাদ দেন আর সেই বেচারী ভীষণ ঘাবড়ে যায় যে, খাবার তো শুধু কয়েকজনের অনুমান করে রান্না করা হয়েছে, অথচ আসছে এত লোক! এখন কী হবে? কিন্তু মহানবী (সা.) সেখানে পৌঁছতেই প্রশান্তচিত্তে হাড়ি এবং আটার পাত্রে দোয়া করেন আর এরপর বলেন, এখন রুটি বানানো আরম্ভ করো। এরপর তিনি ধীরে ধীরে খাবার বিতরণ করার কথা বলেন। জাবের বর্ণনা করেন যে, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! সেই পরিমাণ খাবারেই সবাই তৃপ্তি সহকারে আহার করে স্থান ত্যাগ করে, অথচ তখনও আমাদের হাড়ি একইভাবে টগবগিয়ে ফুটছিল এবং আটা একইভাবে রান্না হচ্ছিল।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৫৭৮)

আহযাবের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বাকি কথা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব। দোয়ার দিকে আমি মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকি, এদিকে অনেক মনোযোগ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমানকে দৃঢ়তা দান করুন আর প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক দেশে বসবাসকারী আহমদীদের, বাংলাদেশে, পাকিস্তানে এবং অন্যান্য স্থানেও সকল অনিষ্ট থেকে সকল আহমদীকে তিনি রক্ষা করুন। আর পৃথিবীকেও, যে আগুনে তারা পড়তে যাচ্ছে এবং যেদিকে যাওয়ার চেষ্টা দ্রুত করে যাচ্ছে, তা থেকে আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল শক্তির অধিকারী। যদি এই লোকেরা এখনও সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এসব বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, তাদের যেন বিবেক বুদ্ধির উদয় হয়।

(সৌজন্যে: আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল,২ অক্টোবর, ২০২৪)

****

সমস্ত উন্নতি খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন, "তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খেলাফতের সাথে স?পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খেলাফতকে কায়েমরাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন করো এবং খেলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা স?পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খেলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।"

(দরসে কুরআন, পৃ. ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১)

শুরু কর? এই ধরণের যুদ্ধ শত্রুদের পক্ষ থেকেই শুরু হয়।

আর যখন সেই যুদ্ধ থেকে রক্ষা পাওয়া তাদের হাতে থাকে, তা সত্ত্বেও যখন তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং জোর করে অন্যদেরকে ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্য করতে চায়, তবে তারা তো উন্মাদ আর তারা শাস্তি পাওয়া যোগ্য। কেননা তাদের কাছে বিকল্প ছিল, তারা আক্রমণ না করলেও পারত। তারা ধর্মের নামে যুদ্ধ না করলেও পারত আর এইরূপে নিজেদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে إِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا আয়াতে এ বিষয়ের উপর আপত্তি করা হয়েছে যে, যখন মুসলমানেরা নিজেরাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তখন খোদা তা'লা তাদেরকে কিভাবে রক্ষা করলেন? এই আয়াতে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। বাহ্যত মোমেনরা যুদ্ধ করবে, কিন্তু তারা এবং অন্যরাও জানে যে, মোমেনরা দুর্বল, জয় লাভ করতে পারবে না। তাই إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ বলার মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত যুদ্ধ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই হবে। মোমেনরা তাঁর অস্ত্র হবেন, যাদের মাধ্যমে তিনি নিজের কাজ করাবেন। বিশ্বজয় করা তাঁরই ক্ষমতার অধীনে থাকবে। তিনিই বিজয় দান করবেন আর এটা এ বিষয়ের প্রমাণ হবে যে, এই যুদ্ধ খোদার পক্ষ থেকে ছিল, কোন মানুষের পক্ষ থেকে ছিল না। পরবর্তী আয়াতেও বলা হয়েছে, وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ অর্থাৎ যারা খোদা তা'লার ধর্মের সমর্থনে দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য করেন। অর্থাৎ বাহ্যত মোমেনরা যুদ্ধ করলেও প্রকৃত আত্মরক্ষার বিধান আল্লাহ্ তা'লার হাতেই থেকেছে।

****

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা রাআদ এর ২৯ নং আয়াত এর ব্যাখ্যায় বলেন: মানুষ অর্থ উপার্জন করে, শাসন করে, তারা সুসন্তানের অধিকারী হয়, সুশীলা স্ত্রী পায়, ভাল বন্ধু পায়, ব্যবসায়ে লাভ করে, কৃষিকাজে লাভ করে, জ্ঞানের জগতে উৎকর্ষ লাভ করে- মোট কথা সব কিছুতেই উন্নতি করে, কিন্তু তবুও মন প্রশান্তি লাভ করে না। একটি বাসনা পূর্ণ হলে দুটি আরও দুঃখ ও বাসনা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর মনের মধ্যে সব সময় এই অনুভূতি কাজ করে যেন যে প্রকৃত বস্তুর বাসনা সে করেছিল তা এখনও পায় নি। যেভাবে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি শিশু কখনও এর বুকে, কখনও তার বুকে আশ্রয় খুঁজে ফেরে, কিন্তু কোথাও স্বস্তি পায় না। কেননা যে বস্তুটি সে খোঁজে তা সে পায় না। অর্থাৎ তার প্রকৃত মাকে সে খুঁজে পায় না। অনুরূপ অবস্থা জাগতিক সমৃদ্ধি অর্জনকারীদের হয়ে থাকে।

আঁ হযরত (সা.) একটি যুদ্ধে এক মহিলাকে দেখেন যার শিশু হারিয়ে গিয়েছিল। সে যে শিশুকেই দেখছিল তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরছিল, আদর করছিল আর তাকে ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে সে তার শিশুকে খুঁজে পায় এবং তাকে নিয়ে শান্তিতে বসে পড়ে। হুযুর (সা.) সাহাবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, যেভাবে ঐ মহিলাটি শিশুকে খুঁজে পাওয়ায় আনন্দিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার তার থেকে বহুগুণ বেশি আনন্দিত হন, যখন তাঁর কোন পাপাচারী বান্দা তাঁর প্রতি মনোযোগি হয়। নবী করীম (সা.) এই ঘটনার অন্য একটি শিক্ষণীয় দিক বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনা বর্ণনা করার পিছনে আমার উদ্দেশ্য হল সেই মহিলা নিজের প্রকৃত গন্তব্য খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কতটা ব্যকুল ছিল, কিন্তু গন্তব্য পাওয়ার পর সে প্রশান্তি লাভ করল। প্রত্যেক মানুষেরও অনুরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করার পর সেই ব্যকুলতা দূর হয় আর মন প্রশান্তি লাভ করে। অতএব, খোদাকে স্মরণ করাই যেহেতু মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাই যখন খোদা লাভ হয়, তখন আর কোন জ্বালা ও ব্যকুলতা থাকে না, থাকে কেবল প্রশান্তি। যে সব মানুষ জাগতিকতার সন্ধানে থাকে, তারা যত উন্নতি করে, ততই তাদের মনের দহন বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু যারা খোদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আর যতই তারা সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ততই তাদের আন্তরিক প্রশান্তি বৃদ্ধি পায়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্বীয় সত্তার অন্বেষণকেই আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই সেই উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হয়, মানুষ তখন প্রশান্তি লাভ করে। আমাদের রাজ্যগুলির অবস্থাই দেখুন। যদিও তাদের নিরাপত্তার বিধান সরকারের মাধ্যমে হয়ে থাকে, কিন্তু কিছু কিছু জমিদার এতটাই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন যে তাদের জন্য বিদেশ থেকে প্যাকেটজাত পানি আসে, তাদের সামনে তা খোলা হয়, তারপরেও অন্য কাউকে খাইয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর রাজা মশাই সেই পানি পান করেন। ঠিক একইভাবে তাদের খাবার হাজার হাজার সতর্কতা অবলম্বনের পর পরিবেশন করা হয়। এর আগে রাঁধুনিকেই খাওয়ানো হয়, এরপর ডাক্তার সেটিকে খেয়ে দেখার পর তার জন্য পরিবেশন করা হয়। যেন প্রতি মুহূর্তেই বিপদ উপস্থিত তাই এত সতর্কতা!

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ:৪১৬-৪১৭)

মৌলিক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গুরুত্ব বিষয়াবলীতে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন: ইসলামে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সাম্যের বিষয়ে নিজের কয়েকটি সংশয়ের উল্লেখ করে এক ভদ্রমহিলা ইসলামের বিভিন্ন বিধিনিষেধের বিষয়ে হুযুরের নিকট দিক-নির্দেশনা যাচনা করেন। এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৬ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখের চিঠিতে এই বিষয়ে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা দেওয়া হল।

উত্তর: আপনার চিঠিতে আপনি নিজের যে সংশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তা ইসলামের শিক্ষা এবং মানব প্রকৃতিকে না বোঝার কারণেই তৈরী হয়েছে। ইসলাম কোথাও এমন দাবি করে নি যে পুরুষ ও নারী সব ব্যাপারেই সমতুল্য। কেবল ইসলামই নয়, মানব প্রকৃতিও পুরুষ ও মহিলার সব দিক থেকে সমান হওয়ার দাবিকে নস্যাৎ করে।

তবে ইসলাম অবশ্যই এই শিক্ষা প্রদান করেছে যে, পুণ্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদেরকে পুরস্কৃত করেন, নিজ কৃপাসমূহের উত্তরাধিকারী করেন, ঠিক সেইভাবেই তিনি নারী জাতিকেও পুরুস্কৃত করেন, স্বীয় কৃপারাজির উত্তরাধিকারী করেন। যেমনটি তিনি বলেন-

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ (سورة آل عمران:196)

অনুবাদ:যতদূর পুরুষ ও নারীর সাক্ষীর সম্পর্ক, মহিলাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই, সেখানে যদি সাক্ষীর জন্য নির্ধারিত পুরুষকে না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে একজন পুরুষের সঙ্গে দুইজন মহিলাকে রাখা হয়েছে, এই জন্য যে, কেননা এই সব বিষয়ে মহিলাদের সরাসরি সম্পর্ক থাকে না, কাজেই সাক্ষী দানকারী মহিলা যদি নিজের সাক্ষী ভুলে যায়,তবে দ্বিতীয় মহিলটি তাকে স্মরণ করাবে। যদিও এতেও সাক্ষী একজন মহিলা। এমন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকার কারণে তার ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাকে দৃষ্টিতে রেখে সতর্কতা হিসেবে দ্বিতীয় মহিলাকে তার সাহায্যের জন্য এবং তাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে। কুরআন করীমের যুক্তিও এই অর্থকে সমর্থন করছে।

(আলে ইমরান: ১৯৬)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

(আল বাকারা: ২৮৩)

এবং যতদূর মহিলাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সরাসরি সম্পর্ক, তা হাদীস থেকে প্রমাণ হয়। হুযুর (সা.) এক মহিলার সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে এক বিবাহিত দম্পতির বিচ্ছেদ করিয়ে দেন, এজন্য যে সেই মহিলা সাক্ষী দিয়েছিল, ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সে দুধ পান করিয়েছিল। হযরত উকবা বিন হারিস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আবু আহাব বিন আযীযের কন্যার সঙ্গে নিকাহ করেন। এরপর এক মহিলা এসে দাবি করে, সে উকবা এবং সেই মেয়েটিকে দুধ পান করিয়েছি যাকে উকবা নিকাহ করেছে। (অতএব এরা পরস্পর দুধ ভাই=বোন, এদের মধ্যে নিকাহ বৈধ নয়)। উকবা বললেন, আমি জানি না যে তুমি আমাকে দুধ খাইয়েছিলে কি না, আর তুমি এর আগে এ সম্পর্কে আমাকে কখনও অবগতও করনি। অতঃপর উকবা বাহনে চড়ে রসুলুল্লাহ (সা.)এর কাছে মদিনায় পৌছন। তাঁকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে নবী (সা.) বললেন, এখন যেহেতু এই কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তুমি কিভাবে তাকে তোমার নিকাহ বন্ধনে রাখতে পার? উকবা সেই মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় এবং অন্য একটি মেয়েকে নিকাহ করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইলম)

যতদূর তালাক ও খোলার সম্পর্ক, এক্ষেত্রেও কোন তারতম্য নেই। বরং পুরুষকে তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি মহিলাকেও খোলা নেওয়ার অধিকার প্রদান করা ইসলামের এটি অনুগ্রহ। এক্ষেত্রেও পুরুষ ও মহিলাকে সমান সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। পুরুষ যখন তালাক দেয়, তখন তাকে স্ত্রীকে আর্থিক বিষয়ের যাবতীয় অধিকার দিতে হয়, উপরন্তু স্ত্রী ইতিপূর্বে যা কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে, তা থেকেও কিছু ফেরত নিতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রী যখন স্বেচ্ছায় স্বামীর কোন অপরাধ ছাড়াই খোলা নেয়, তখন তাকেও পুরুষদের কিছু আর্থিক অধিকার, যেমন হক মোহর ইত্যাদি ফিরিয়ে দিতে হয়। কিন্তু যদি স্ত্রীর খোলা নেওয়ার ব্যাপারে স্বামীর কোন অন্যায় প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে দ্বিগুণ লাভ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে হক মোহরও তার প্রাপ্য, যার মীমাংসা অবশ্যই বিচার বিভাগ সব কিছু দেখে করে থাকে।

আহলে কিতাবের সঙ্গে বিয়ে করা, অভিভাবকের প্রয়োজনীয়তা এবং পুরুষদের একাধিক বিবাহ করার অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বস্তুত মহিলার নিরাপত্তা, সম্ভ্রম ও সম্মানকে দৃষ্টিতে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পুরুষদের তুলনায় নারীকে সাধারণত দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন, তাদের স্বভাবে প্রভাব গ্রহণ করার বৈশিষ্ট নিহিত রেখেছেন। কাজেই একজন মুসলমান মহিলার একজন আহলে কিতাব পুরুষকে বিবাহ করা থেকে বিরত রেখে তার ধর্মকে রক্ষা করা হয়েছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের সম্মতির পাশাপাশি তার অভিভাবকের সম্মতির শর্ত রাখার অন্যান্য বহু উপযোগিতার মাঝে একটি হল মহিলাকে সাহায্যকারী এবং রক্ষক হিসেবেও একজনকে দেওয়া। যাতে মেয়ের বিয়ে পর তার শ্বশুর বাড়ির লোক এ বিষয়ে সচেতন থাকে যে, মেয়ে একা নয়, তার খবর নেওয়ার মানুষও আছে।

মেয়েদেরকে এক সময়ে একটি বিবাহের অনুমতি দিয়ে ইসলাম তার সম্মান রক্ষা করেছে। আর মানুষের আত্মাভিমান অনুযায়ীই এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে মেয়েরা বেশি জাহান্নামে যাবে, সেখানে মানুষ এই হাদীসটি অনুবাদ বুঝতে ভুল করেছে। এই হাদীসের মোটেই এই অর্থ নয় জাহান্নামে মেয়েদের বেশি সংখ্যা থাকবে। হুযুর (সা.) বলেছেন,

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ۔

অর্থাৎ-আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে, যেখানে আমি দেখেছি, এমন মেয়েদের সংখ্যা বেশি যারা নিজেদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ যে সব মেয়েরা নিজেদের কর্মদোষে জাহান্নামে ছিল, তাদের অধিকাংশই এমন মেয়ে যারা নিজেদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ।

কাজেই, প্রথমত এই হাদীসের মোটেই এই অর্থ নয় যে জাহান্নামে পুরুষদের থেকে মহিলারা বেশি সংখ্যায় থাকবে। দ্বিতীয়ত এখানে সেই সব মেয়েদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণও বলে দেওয়া হয়েছে, তারা এমন মেয়ে হবে যারা কথায় কথায় খোদা তা'লার সেই সব অনুগ্রহকে অস্বীকার করে, যা তাদের স্বামীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাদের উপর করেছেন।

এছাড়া এর বিপরীতে হাদীসে পুণ্যবতী ও পূতঃপবিত্র মহিলাদের পায়ের তলায় জান্নাত থাকারও সুসংবাদ শোনানো হয়েছে, যা কোন পুরুষের সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় নি।

এছাড়া ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের কিছু কিছু অধিকার ও কর্তব্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করেছে। কায়িক পরিশ্রম করার এবং সংসারের যাবতীয় চাহিদাবলী পূরণের দায়িত্ব পুরুষদেরকে দেওয়া হয়েছে আর মহিলাদেরকে ঘর-সংসার এবং সন্তানের দেখাশোনা ও লালন পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বাইরের দৌঁড় ঝাঁপ করার জন্য পুরুষকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী নির্বাচিত করা হয়েছে আর মেয়েদের প্রকৃতি ও সম্ভ্রমকে দৃষ্টিতে রেখে সংসারের নেতৃত্ব তার হাতে দেওয়া হয়েছে।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'ধর্ম এবং বুদ্ধির দিক থেকে মেয়েদের মধ্যে এক প্রকারের ঘাটতি আছে। এতে কোন সন্দেহ নেই, কেননা এটিও মেয়েদের প্রকৃতি অনুযায়ীই বলা হয়েছে। ধর্মের বিষয়ে ঘাটতি আঁ হযরত (সা.) নিজেই বলেছেন, মেয়েদের জীবনের বড় অংশে প্রতি মাসে তাদের জন্য এমন কয়েকটি দিন আসে যখন তারা যাবতীয় ইবাদত থেকে অব্যহতি পায়। আর দেখতে গেলে মেয়েদের উপর এটিও এক প্রকারের খোদা তা'লার কৃপা। অপরদিকে বুদ্ধির ঘাটতির বিষয়েও মেয়েদেরকে ছোট করা হয় নি, এর দ্বারা মেয়েদের সরলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তারা যে সরল প্রকৃতির তার প্রমাণ বর্তমান যুগের মেয়েরা নিজেরাই দিয়ে চলেছে। কেননা পশ্চিমা দেশের পুরুষেরা তাদেরকে স্বাধীনতার প্রলোভন দেখিয়ে যেভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, তা সত্যবাদীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট সত্যবাদী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর এই কথার সত্যতার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

পুরুষেরা নিজেদের কাম লালসা চরিতার্থ করতে তাদেরকে বাড়ির ঘেরাটোপ থেকে বের করে বাজারে এনে ফেলেছে। আর ইসলাম জীবন জীবিকার যে দায়িত্ব পুরুষদের উপর ন্যস্ত করেছিল, সেখানেও পুরুষরা মেয়েদের সরলতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দায়িত্ব তাদেরকে ভাগ করে দিয়ে তা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, যেখানে তাদেরকে পুরুষদের মত পরিশ্রম করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পুরুষদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয় যারা অনেক সময় নিজেদের দৃষ্টি লালসা পুরো করতে বিভিন্ন ভাবে তাদের উপর নজর দেওয়ার চেষ্টা করে।

আর যদি গভীরে গিয়ে চিন্তা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে পশ্চিমি দুনিয়ার মহিলা ও পুরুষদের সাম্যের ঘোষণা কেবলই একটি ফাঁপা বুলি। এই পশ্চিমি দুনিয়াতে একটিও এমন দেশে নেই যার প্রশাসন তন্ত্র পরিচালনাকারী সংসদীয় ব্যবস্থাপনায় পুরুষদের সমতুল্য মেয়েরা রয়েছে। এই পশ্চিমি দেশগুলিতেই বহু জায়গায় একটি চাকরীর জন্য একজন পুরুষকে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, সাধারণত সেই একই চাকরীর ক্ষেত্রে একজন মহিলাকে সেই সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। এর এই সবই মেয়েদের সরল হওয়ার জীবন্ত সাক্ষী।

যতদূর কুরআন করীমের পুরুষকে 'কাওয়াম' হিসেবে আখ্যায়িত করার প্রসঙ্গটি রয়েছে, সেখানে কুরআন করীম স্বয়ং এর কারণসমূহও বর্ণনা করেছে। একটি কারণ হল, পরিবার পরিচালনার জন্য এক পক্ষকে অপর পক্ষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয় কারণ হল, পুরুষ তার সম্পদ স্ত্রীর উপর খরচ করে।

এক পক্ষের উপর অপর পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কারণ মানব প্রকৃতির দাবি সঙ্গত, কেননা, আমরা যদি জাগতিক ব্যবস্থাপনার দিকে দৃষ্টি দিই,তবে দেখব সর্বত্রই এক পক্ষ উপরে থাকে আর অপর পক্ষ তুলনায় কিছুটা নীচে অবস্থান করে। পৃথিবীতে যদি সকলে সমান হত,বা যদি বলি সকলেই বাদশাহ হয়ে যেত, তবে পৃথিবী একদিন চলতে পারত না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা কিছু মানুষকে বড় আর কিছু মানুষকে ছোট, কিছু মানুষকে ধনী আর কিছু মানুষকে দরিদ্র করেছেন। আমরা দেখি যে প্রত্যেক দেশে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি তন্ত্র থাকে। সেই দেশের সকলেই যদি তন্ত্রের অংশ হয়ে যায় তবে দেশ চলবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা পারিবারিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পুরুষকে তুলনামুলকভাবে বেশি ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে দেশের নেতা এবং দেশের তন্ত্রের অতিরিক্ত ক্ষমতার পাশাপাশি সেই অনুপাতে অতিরিক্ত কর্তব্য ও দায়িত্বও এসে পড়ে। অনুরূপভাবে ইসলাম পুরুষের উপর মহিলাদের তুলনায় অতিরিক্ত দায়িত্বও ন্যস্ত করেছেন।

কাজেই পুরুষ ও মহিলার অধিকার কর্তব্যের নিরিখে ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রকৃতির বিধান অনুসারেই নির্ধারিত হয়েছে, এতে কোনও প্রকার ঘাটতি নেই।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর মজলিসে ইরফানে বর্ণিত একটি নির্দেশের আলোকে চাচা ও মামার সামনে পর্দা করার বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের কাছে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার আবেদন করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ১লা জুন তারিখে লেখা চিঠিতে উত্তরে বলেন-

উত্তর: আপনি চিঠিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর যে নির্দেশের উল্লেখ করেছেন তা সূরা নূরের ৩২ নং আয়াতের আলোকে মজলিসে ইরফানে একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রদান করা হয়েছিল।

একথা সঠিক যে এই আয়াতে বর্ণিত যে যে আত্মীয়ের সামনে মেয়েদেরকে পর্দা না করার অব্যহতি দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে চাচা ও মামার উল্লেখ নেই। কিন্তু এরা উভয়ে 'মাহরাম' (যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ নয়) -এরই অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি হুযুরও তাঁর মন্তব্যে একথা বলেছেন। আর সূরা নূরে বর্ণিত কুরআনী নির্দেশ থেকেও এটা প্রমাণ হয়। কেননা এদের উভয়ের সঙ্গে নিকাহ করার হুরমত (অবৈধতা) বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়াও হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর (সা.) তাঁকে চাচার সামনে পর্দা না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সাথে পর্দার বিষয়ে একথাও দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মাহারম আত্মীয়দের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক শ্রেণীর আত্মীয়দের সামনে পর্দার বিষয়ে অব্যহতির পৃথক পৃথক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সূরা নূরে যে সব মাহারম আত্মীয়ের সামনে পর্দা না করার অব্যহতি দেওয়া হয়েছে,তাদের মধ্যেও প্রত্যেক আত্মীয়ের থেকে অপর এক আত্মীয়ের সামনে পর্দার অব্যহতির বিষয়ে পৃথক পৃথক রূপ হবে। যেমন স্বামীর সামনে পর্দার যে অব্যহতি রয়েছে, তা সেই আয়াতেই বর্ণিত পিতা, পুত্র ও ভাইদের সামনে পর্দার অব্যহতি থেকে আলাদা। কাজেই যেভাবে এই আয়াতে বর্ণিত আত্মীয়দের সামনে পর্দার বিভিন্ন রূপ রয়েছে, অনুরূপভাবে অন্যান্য মাহারম আত্মীয়ের সামানেও পর্দার অব্যহতির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন:বাংলা ডেস্ক-এর শ্রদ্ধেয় ইনচার্জ সাহেব হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, বাংলাদেশে জাতীয় বীরদের ভাস্কর্য নির্মাণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ইসলামে কোন বীরপুরুষের ভাস্কর্য নির্মাণ করা কি বৈধ?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।

উত্তর:পবিত্র কুরআন পাঠে জানা যায়, ইসলামপূর্ব নবীদের যুগে সদুদ্দেশ্যে চিত্রাঙ্কন এবং ভাস্কর্য নির্মাণ করা হতো। যেমন, হযরত সুলায়মান (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জিন্নদের একটি দল তাঁর আকাঙ্ক্ষানুসারে তাঁর জন্য বিভিন্ন ভাস্কর্য নির্মাণ করতো

(সূরা আস্ সাবা: ১৪)।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আহলে কিতাবদের কাছে বিভিন্ন নবীর ছবি ছিল, যাঁদের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর ছবিও ছিল।

(আবু আব্দুল্লাহ্ ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম আল-জা'ফী রচিত আত-তারীখুল কবীর, প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৭৯)

এছাড়া শিশুদের খেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের পুতুল ইত্যাদিও হয়ে থাকে। যেমন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, শৈশবে তাঁর কাছেও খেলনা পুতুল এবং পাখাবিশিষ্ট ঘোড়া ছিল; মহানবী (সা.)ও সেগুলো দেখেছেন কিন্তু তিনি সেগুলো সম্পর্কে কোন প্রকার অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ করেন নি।

(সুনান আবী দাউদ, কিতাবুল আদাব, বাবু মা ইয়াজূযু মিনাল গাযাবি ওয়াশ্শাদ্দাতিল আমরিল্লাহ্)

একইভাবে সেযুগের রীতি অনুসারে মহানবী (সা.) পেইন্টিং এর সাহায্যে ছবি আঁকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন এবং ছবি আঁকার কাজকে অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য আখ্যায়িত করেন।

(বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ', বাবু বায়'য়িত্ তাসাভীরিল্লাতী লাইসা ফীহা রূহুন ওয়ামা ইউকরাহু মিন যালিকা)

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ যুগের হাকাম ও আদল (তথা ন্যায়বিচারক ও প্রকৃত মীমাংসাকারী) হিসেবে তাঁর মনিব ও অভিভাবক সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে মহানবী (সা.)-এর পরম প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশ, ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাততথা, সংকল্পের ওপরই কর্মের পরিণাম নির্ভর করে)- এর আলোকে এই সমস্যার সমাধান দিয়েছেন, অর্থাৎ পবিত্র উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা হলে তা বৈধ কিন্তু সেই একই কাজ যদি কোন পবিত্র উদ্দেশ্যে না করা হয় তাহলে তা অবৈধ হবে। যেমন, হুযূর (আ.) তবলীগ এবং সত্যের বাণী পৌঁছানোর লক্ষ্যে একদিকে নিজের ছবি প্রচার করার অনুমতি দিয়েছেন, যে কারণে সে যুগের নামধারী মোল্লারা এই পবিত্র উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে নোংরা ও অকথ্য ভাষায় তা বর্ণনা করেছে এবং এর বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে উত্তেজিত করেছে, তখন এসব বিরুদ্ধবাদীদের উত্তর দিতে গিয়ে

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

হুযূর (আ.) বলেন, 'এরা যদি ছবি উঠানোকে এতটাই মন্দ জ্ঞান করে তাহলে রাজার ছবি সমৃদ্ধ রূপি এবং বিভিন্ন মুদ্রা নিজেদের বাড়ি এবং পকেট থেকে বের করে কেন ফেলে দেয় না আর একইভাবে নিজেদের চোখও কেন তুলে ফেলে না? কেননা এর মধ্যেও তো বিভিন্ন জিনিসের ছবি প্রতিফলিত হয়।' অপরদিকে হুযূর (আ.) এই কাজই কোন বৈধ কারণ ছাড়া করা খুবই অপছন্দ করেছেন এবং একে বেদাত আখ্যায়িত করে এতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে উভয় আঙ্গিক সুস্পষ্ট করতে গিয়ে হুযূর (আ.) বলেন,

"আমি এ বিষয়ের ঘোর বিরোধী অর্থাৎ, কেউ যদি আমার ছবি তুলে এবং সেটিকে প্রতিমাপূজারীদের মতো নিজের কাছে রাখে অথবা ছাপায়। আমি কখনও এমন নির্দেশ দিই নি যে, কেউ এমনটি করলে আর আমার চেয়ে প্রতিমাপূজা এবং ছবিপূজার কেউ বেশি শত্রু হবে না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি, বর্তমানে ইউরোপবাসীরা যে ব্যক্তির লেখা পড়তে চায়, প্রথমে তার ছবি দেখার প্রত্যাশা রাখে। কেননা, ইউরোপের দেশগুলোতে দূরদর্শিতার জ্ঞান অনেক উন্নতমানের। এমনকি তাদের অধিকাংশই কেবল ছবি দেখেই চিনতে পারে যে, এমন দাবিকারক সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। উপরন্তু এমন মানুষ শতসহস্র মাইল দূরত্বের কারণে আমার কাছে আসতেও পারে না আর আমার চেহারও দেখতে পারে না তাই ঐ দেশের দূরদর্শিরা ছবির মাধ্যমে আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি অভিনিবেশ করে। এমন অনেক মানুষ আছে যারা ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে আমার কাছে চিঠিপত্র লিখেছেন এবং নিজেদের চিঠিপত্রে লিখেছেন যে, আমরা গভীর অভিনিবেশ সহকারে আপনার ছবি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং জ্ঞানের দূরদর্শিতার মাধ্যমে আমরা মানতে বাধ্য হয়েছি যে, এটি যার ছবি তিনি মিথ্যাবাদী নন।"

(বারাহীনে আহমদীয়ার পরিশিষ্ট, পঞ্চম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, একবিংশ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬)

একইভাবে বলেছেন, ইন্নামাল আ'মালু বিন্‌নিয়্যাততথা, সংকল্পের ওপরই কর্মের পরিণাম নির্ভর করে) এবং ছবি (তোলা) সম্পূর্ণরূপে বারণ, এমনটি আমার বিশ্বাস নয়। পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণিত যে, জিন্ন সম্প্রদায় হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বিভিন্ন ছবি বানাতো এবং বনী ইস্রাঈলের কাছে দীর্ঘদিন নবীদের ছবি ছিল, যাঁদের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর ছবিও ছিল। এছাড়া হযরত জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-কে এক টুকরো রেশমি কাপড়ের ওপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর ছবি দেখিয়েছিলেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়ার পরিশিষ্ট, পঞ্চম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, একবিংশ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫)

তিনি (আ.) আরও বলেন, "পরিতাপের বিষয় হল, এরা অন্যায়ভাবে এসব অযৌক্তিক কথাবার্তা বলে বিরুদ্ধবাদীদেরকে ইসলাম সম্পর্কে হাসিঠাট্টা করার সুযোগ করে দেয়। ইসলাম সকল বৃথা কাজ এবং এমন কাজ যা শির্কের সমর্থন করে- তাকে অবৈধ আখ্যা দিয়েছে, এমন কাজকে নয় যা মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে এবং রোগব্যাধি শনাক্ত করার মাধ্যম কিংবা দূরদর্শীদের হেদায়েত তথা সুপথের নিকটতর করে দেয়। এতদসত্ত্বেও আমি এটি আদৌ পছন্দ করি না যে, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন বাধ্যতামূলক প্রয়োজন ছাড়াই আমার ছবি জনসমক্ষে প্রকাশ করাকে নিজেদের উপার্জন কিংবা ব্যবসায় পরিণত করবে। কেননা, এভাবেই ধীরে ধীরে বেদাত সৃষ্টি হয় এমনকি শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাই আমি আমার সম্প্রদায়কে এক্ষেত্রেও তাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব এমন কাজ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছি। আমি কোন কোন ভদ্রমহোদয়ের কার্ড দেখেছি এবং তার নীচের দিকে তাদের ছবি দেখেছি। আমি এমন (আত্ম) প্রচারের ঘোর বিরোধী আর আমি চাই না যে, আমার সম্প্রদায়ের কেউ এমন কাজ করুক। সঠিক এবং প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে একটি কাজ করা ভিন্ন বিষয় কিন্তু হিন্দুদের মতো যারা নিজেদের প্রবীণদের ছবি দেওয়ালের বিভিন্ন স্থানে টাঙিয়ে রাখে, সেটি ভিন্ন বিষয়। সর্বদা দেখা গেছে, এমন মূর্খতায় পরিপূর্ণ কাজ শির্কে রূপান্তরিত হয় এবং এর মাধ্যমে বড়ো বড়ো সমস্যার সৃষ্টি হয়।"

(বারাহীনে আহমদীয়ার পরিশিষ্ট, পঞ্চম খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, একবিংশ খণ্ড, পৃ ৩৬৭)

অতএব, বাংলাদেশে নির্মাণাধীন এসব ভাস্কর্য যদি কোন সদুদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়, যার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি- তাহলে এসব নির্মাণে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি কেবল বাহ্যাড়ম্বর ও লৌকিকতার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয় তাহলে (এটি) অন্যায় এবং অবৈধ কাজ।

প্রশ্ন:এক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেন, মহানবী (সা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-এর কাছে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে জানতে চান যে, তোমার চাচার পুত্র কোথায়?

একইভাবে মহানবী (সা.) হযরত আব্বাস (রা.) এবং আবু তালেবের জন্যও চাচা শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর হযরত আলী (রা.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর জন্য চাচি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই শব্দের কিছুটা ব্যাখ্যা করে দিন। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর:প্রত্যেক সমাজেই কিছু প্রথা বা লোকাচার এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রবাদ থেকে থাকে, যা সেই সমাজকে দৃষ্টিপটে রাখলে অনুধাবন করা সম্ভব। যেমন, কোন কোন পরিবারে পিতার সাথে কোন ব্যক্তির (আত্মীয়তার) যে সম্পর্ক রয়েছে, পারিবারিক প্রথা ও প্রবাদের আলোকে সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক সন্তানদের জন্য ব্যবহৃত হয়। হযরত আলী (রা.) যেহেতু মহানবী (সা.)-এর চাচার পুত্র ছিলেন, তাই সেই সামাজিক প্রথার কারণেই মহানবী (সা.) নিজের কন্যার কাছে জানতে চান যে, তোমার চাচার পুত্র কোথায়?

এছাড়া আরবে 'ইয়া ইবনা আম্মি' এবং 'ইয়া ইবনা আখী'অর্থাৎ হে আমার চাচার পুত্র এবং হে আমার ভাতিজা প্রভৃতি বাক্যের ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। কাজেই, বয়স্ক ব্যক্তি নিজের চেয়ে কম বয়সের মানুষকে সম্বোধন করার জন্য 'ইয়া ইবনা আখী' অর্থাৎ, হে আমার ভাতিজা বাক্য ব্যবহার করে আর একইভাবে স্ত্রী তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করার পরিবর্তে ইয়া ইবনে আম্মি) অর্থাৎ, হে আমার চাচার পুত্র বাক্য ব্যবহার করে থাকে।

হযরত আলী (রা.)-এর হযরত খাদীজা (রা.)-কে চাচি শব্দ বলে সম্বোধন করার যতটুকু সম্পর্ক, আরবীতে ফুপু এবং চাচি উভয়ের জন্য আম্মাতী শব্দ ব্যবহৃত হয়। মনে হচ্ছে, আপনি কোথাও আম্মাতী শব্দ পড়ে তার অর্থ চাচি মনে করেছেন। অথচ হযরত খাদীজা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর ক্ষেত্রে এই শব্দের অর্থ হবে, ফুপু। কেননা, হযরত খাদীজা (রা.) এবং হযরত আবু তালেব (রা.)-এর বংশধারা পঞ্চম পুরুষে গিয়ে কুসাই বিন কিলাবের সাথে পরস্পর মিলিত হয় আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত খাদীজা (রা.) সম্পর্কের দিক দিয়ে হযরত আলী (রা.)-এর ফুপু হতেন।

প্রশ্ন:এক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, আমার কাজিনের মৃত্যুতে কোন কোন বন্ধু অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করেছেন, যে কারণে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। এছাড়া সেই বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে আরও জানতে চান, ইসলামের বিরোধিতায় মারা গেছে, এমন আত্মীয়ের জন্য পবিত্র কুরআন আমাদেরকে দোয়া করতে বারণ করে কি? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৩ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পত্রে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।

উত্তর:আপনার কাজিনের মৃত্যুতে যদি কোন আহমদী কোন প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করে থাকেন তাহলে নিশ্চিতরূপে সেই আহমদী ভুল করেছেন। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে চলে যায়। তিনি যেভাবে চাইবেন তার সাথে ব্যবহার করবেন, অন্য কোন ব্যক্তির এ বিষয়ে কোনরূপ মতামত দেওয়ার অধিকার নেই। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"খোদা তা'লার সাথে প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন ভিন্ন হিসাব হয়ে থাকে। কাজেই, প্রত্যেককে নিজের কাজকর্মের সংশোধন এবং যাচাই-বাছাই করা উচিত। অন্যদের মৃত্যু তোমাদের জন্য শিক্ষামূলক এবং হোঁচট থেকে রক্ষা লাভের কারণ হওয়া উচিত। তোমরা হাসিঠাট্টায় দিন কাটিয়ে খোদা তা'লার বিষয়ে আরও উদাসিন হয়ে যাবে, এমন হওয়া উচিত নয়।"

(মালফুযাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৭)

এছাড়া যেমনটি আপনি আবেদ খান সাহেবের ডায়েরীর বরাতে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

আপনার পত্রে লিখেছেন, আমার উত্তর তো আপনি পড়েই নিয়েছেন, আমরা একে কোন প্রকার ঐশী নিদর্শন আখ্যায়িত করতে পারি না, কেননা আপনার কাজিনের আহমদীয়া জামা'তের সাথে কোন মোকাবিলাও চলছিল না আর না-ই সে জামা'তকে এমন কোন চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল- যাকে মোকাবিলা মনে করা যেতে পারে।

ইসলাম কোন মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় না বরং তার কর্মদ্বারা অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। যেমন, পবিত্র কুরআনে হযরত লূত (আ.) তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সম্বোধন করে বলেন, 'আমি তোমাদের কার্যকলাপকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি।' (সূরা আশ্ শো'আরা: ১৬৯)।

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের নির্দেশ দিয়েছেন, 'তোমরা যখন শোনো যে, আল্লাহ্ তা'লার আয়াতসমূহকে নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে; তখন যারা হাসিবিদ্রূপ করছে তাদের সাথে তোমরা বসবে না।'

(সূরা আন্ নিসা: ১৪১)

মোটকথা, মানুষের প্রতি ঘৃণা নয় বরং তাদের কার্যকলাপের প্রতি অসন্তোষ প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই, প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং অনিন্দ্য সুন্দর। ইসলাম তো ঘোর শত্রুর মৃত্যুতেও আনন্দিত হওয়ার শিক্ষা দেয় না বরং তার মৃত্যুতেও একজন সত্যিকার মু'মিনের এই ভেবে দুঃখ হয় যে, হায়! এই ব্যক্তি যদি সুপথ লাভ করতো। আহমদীয়াতের চরম শত্রু এবং আমাদের মনিব ও অভিভাবক সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র সত্তা সম্পর্কে কটুবাক্য ব্যবহারকারী ইসলামের শত্রু পণ্ডিত লেখরাম যখন ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধ্বংস হয় তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার ধ্বংসের পরও তার সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন,

"একজন মানুষের প্রাণনাশের কারণে আমরা বেদনায় বিমূঢ়, তবে খোদার একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার কারণে আমরা আনন্দিতও বটে। কেন আনন্দিত? কেবল জাতির মঙ্গালের জন্য। হায়! তারা যদি চিন্তাভাবনা ও অনুধাবন করতো যে, কত সুস্পষ্টভাবে কয়েক বছর পূর্বে সংবাদ প্রদান করা, এটি (কোন) মানুষের কাজ নয়। এখন আমাদের হৃদয়ের অবস্থা বড়োই বিস্ময়কর। বেদনাও আছে আবার আনন্দও। বেদনার কারণ হল, যদি লেখরাম বিরত হতো, বেশি না হলেও কমপক্ষে কটুবাক্য ব্যবহার করা থেকেও যদি বিরত হতো তাহলে আল্লাহ্‌র কসম! আমি তার জন্য দোয়া করতাম। আর আমি আশা করতাম, তাকে যদি টুকরো টুকরোও করে ফেলা হতো তবুও সে প্রাণে রক্ষা পেত।"

(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২৮)

বাকী থাকলো, ইসলামের বিরোধিতায় মৃত্যুবরণকারী কোন ব্যক্তির জন্য দোয়া করার বিষয়টি, ইসলাম কেবল মুশরিক (বা প্রতিমাপূজারী), যারা খোদা তা'লার সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়; তার জন্য ক্ষমার দোয়া করতে বারণ করেছে। অন্য কারও জন্য দোয়া করতে বারণ করা হয় নি। (সূরা আত্ তাওবা: ১১৪)

প্রশ্ন:জনৈকা ভদ্রমহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, আমি আমার ছেলের সাথে আমার ছোটো ভাইকেও ত্রিশ বছর পূর্বে দুধ পান করিয়েছিলাম। এখন আমার বড়ো ভাইয়ের মেয়ের সাথে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, এই বিয়ে হতে পারে কী? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।

উত্তর:দুধপান করানো সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য হল, 'আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে যাদের সাথে বিয়ে করা বারণ তা যদি দুধপান করানোর কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে দুধপান করানোর কারণে সেসব ক্ষেত্রেও বিবাহ অবৈধ।'

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুশ্ শাহাদাহ্)

তবে শর্ত হল, 'শিশুকে তার দুধ পান করার বয়সে পাঁচবার পেটভরে দুধ পান করতে হবে।'

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুর্ রেযা')

এর পাশাপাশি একথাও দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, দুধপান করার কারণে যে নিষেধাজ্ঞা এটি কেবলমাত্র দুধপানকারী শিশু এবং পরবর্তীতে তার বংশধরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। সেই দুধপানকারী শিশুর অন্য ভাই-বোনদের ওপর এই দুধপান করার কোন প্রভাব পড়ে না। কাজেই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার সেই ভাই যিনি আপনার দুধ পান করেন নি তার ছেলের সাথে আপনার মেয়েকে বিয়ে দিতে কোন সমস্যা নেই।

আল্লাহ্ তা'লা উভয় পরিবারের জন্য এই বিয়ে অনেক কল্যাণমণ্ডিত করুন। সন্তানদের পক্ষ থেকে আপনার চোখকে প্রশান্তি দান করুন আর সর্বদা আপনাদেরকে তাঁর কৃপারাজিতে ভূষিত করতে থাকুন, আমীন।

প্রশ্ন:জনৈক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জানতে চেয়েছেন যে, আমি শুনেছি, একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, প্রথম যে সৈন্য কনস্টান্টিনোপলে পা রেখেছিল সে জান্নাতে যাবে, এটি কি সঠিক?

হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৪ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। উত্তর:আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে শান্তি-সৌহার্দ্য এবং প্রেম-ভালবাসার শিক্ষাসহ পৃথিবীতে আবির্ভূত করেছেন। কিন্তু যখন ইসলাম বিরোধীরা তাদের বিরোধিতায় সীমাতিক্রম করে তখন আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকেও প্রত্যুত্তরে জেহাদের অনুমতি প্রদান করেন। (সূরা আল্ হাজ্জ: ৪০) এর অধীনে মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে যেখানে মুসলমানদের ওপর আক্রমণকারীদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছেন সেখানে আল্লাহ্ তা'লার অনুমতিক্রমে মুসলমানরা এমনসব অঞ্চল এবং দেশের ওপরও আক্রমণ করেছে যেখানে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হতো আর অন্যান্য গোত্র ও অঞ্চলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা হতো। আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ লাভ করে মহানবী (সা.) এই নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে লড়াইকৃত এসব যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পাশাপাশি সাফল্যেরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এর মধ্যে এটিও একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, '(সেই যুগের দুটি পরাশক্তি রোম ও পারস্য হতে) রোম (খ্রিষ্টান সরকার) শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমার উম্মতের মধ্য হতে যারা বের হবে তারা জান্নাতী হবে'

(বুখারী কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সয়ের)।

অনুরূপভাবে আরেকস্থানে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী সৈন্য এবং তাদের দলনেতা কতই না উত্তম সৈন্য এবং কতই না উত্তম দলনেতা হবে।'

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস নং: ১৮১৮৯)

এই উভয় হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মহানবী (সা.)-এর অন্যান্য ঐশী আগাম সংবাদের ন্যায় নির্ধারিত সময়ে অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন: কুরআন করীমের সূরা রহমানে জিন এবং ইনস-এ উল্লেখ রয়েছে। ইনস-এর অর্থ মানুষ আর জিন বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আনোয়ার বলেন: জিন বলতে অনেক কিছু হতে পারে। যে কোন অপ্রকাশিত সত্তাকে জিন্ন বলে। এই কারণে হাদীসে ব্যাকটেরিয়ার জন্যও জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে জঙ্গালে তোমরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর নিজেকে পরিস্কার করার জন্য যদি কোন হাড়ের টুকড়ো পাও, তবে সেটি ব্যবহার করো না। কেননা তাতে জীবাণু থাকে। অদৃশ্য বস্তু থাকে। তাই এর পরিবর্তে পাথর ব্যবহার করো।

হুযূর আনোয়ার বলেন, পাহাড়ের মধ্যে অন্তরালে জীবনযাপনকারী লোকদেরও জিন্ন বলা হয়। যে সব প্রভাবশালী ব্যক্তি সচরাচর জনসমক্ষে আসে না, তারাও জিন্ন। এই কারণে কিছু মানুষকে এজন্যও জিন বলা হয়ে থাকে কারণ তারা নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার কিছুটা উর্দ্ধে বলে মনে করে। তাই এভাবে বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। সারসংক্ষেপ এই যে, প্রত্যেক গোপন বস্তু বা নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নকারী মানুষদের জন্য জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) প্রদত্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ-নির্দেশনা।

"আমি বারবার পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি, সন্তানরা বাইরে কেমন পরিবেশে ওঠা-বসা করে তার প্রতিও দৃষ্টি রাখুন আর ঘরে যখন তারা টিভির প্রোগ্রাম দেখে বা ইন্টারনেট ইত্যাদি ব্যবহার করে তখনো সজাগ দৃষ্টি রাখুন।"

(খুতবা জুমআ, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩,বায়তুল ফুতুহ, লন্ডন)

১২৯ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৪ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 24 Oct, 2024 Issue No.43

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তফসীর পড়ুন। ছোটরা অনুবাদ শেখার চেষ্টা কর। যুক্তরাজ্যে ওয়াকফে নও ইজতেমায় অনেকগুলি দিকনির্দেশনা দিয়েছিলাম, সেগুলি জার্মান ও উর্দুতে ছাপানোর পর আপনাদের হাতে থাকা উচিত। দুটি পৃথক পৃথক ইজতেমায় আমি এই নির্দেশনাগুলি দিয়েছিলাম। ছোট বড় প্রত্যেকে এগুলি অনুশীলন করার চেষ্টা কর। আপনারা বড় হচ্ছেন আর সেই সঙ্গে আপনাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বস্ততার মানও বৃদ্ধি পেতে থাকা উচিত।

তালহা আহমদ বাট নামে ওয়াকফে নও নিদেবদন করে যে, আমার দুটি কথা বলার ছিল। প্রথমত আমি হুযুর আনোয়ারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। হুযুর আনোয়ার জার্মানী এসেছেন এবং আমাদেরকে এই ক্লাস করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি ভীষণ আনন্দিত। আমরা আপনাকে দেখে এবং আপনার কথা শুনে অনেক খুশি হয়েছি।

দ্বিতীয় কথা হল, বাইরে অনেক শীত। আপনি শীতবস্ত্র গায়ে দিন। হুযুর আনোয়ার বলেন: জাযাকাল্লাহ।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তালহা আহমদ জানায় তার বয়স ১৬ বছর। পৈতৃক সূত্রে তার শিকড় জেহলমে আর তার মা রাবোয়ার। এখন আমি জিমনিসিয়াম যাচ্ছি আর ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চাই। আমার জন্য দোয়া করবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: মাশাআল্লাহ। ডাক্তার হওয়ার জন্য রসায়ন বিদ্যা ও জীববিদ্যায় আগ্রহ থাকা চায়।

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে প্রদত্ত হুযুর আনোয়ারের ভাষণ প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি ভাষণ দেওয়ার পর সোজা জার্মানী চলে আসি। যাইহোক এখন ভাষণ প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এখন প্রকাশ্যে আসবে যেগুলি আমাদের প্রেস বিভাগ প্রকাশ করবে অথবা প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করবে। মাজিদ সাহেব রিপোর্ট প্রস্তুত করছেন। পরে লিখবেন। উর্দু জানলে আলফজল পত্রিকায় পড়ে নিও, না পড়তে না জানলে অন্য কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। কিন্তু যাইহোক দুই তিনটি অভিমত আমার কাছে এসেছে, সেগুলিতে তারা একথাই জানিয়েছে যে, ভাষণ খুব সুন্দর ছিল। একজন জানিয়েছেন, যে বার্তা ইউরোপকে দেওয়া হয়েছে সেটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক বার্তা, এর জন্য সাহসের প্রয়োজন। আর এই বার্তাটির প্রয়োজনও ছিল। তিনটি বার্তার মধ্যে একটি হল ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সারা বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। মুদ্রা ও মুক্ত বাণিজ্যের বিষয়েও সারা বিশ্বের এক হওয়া উচিত। এছাড়া অভিবাসনের ক্ষেত্রেও এমন সব নীতি প্রণীত হওয়া উচিত যাতে সারা বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হয়।

সি.এন.এন নিজেদের ওয়েব সাইটে এই তিনটি বার্তা লিখে আমার নাম ও ছবি দিয়ে শিরোণাম দিয়েছে- 'Qutoe of the day'। এতটা গুরুত্ব দিয়েছে তারা । অন্যান্য অভিমতগুলিও ভাল।

একজন খুদ্দাম অর্থনৈতিক সংকটের বিষয়ে প্রশ্ন করলে হুযুর আনোয়ার তার উত্তরে বলেন-যে প্রচেষ্টা হচ্ছে তাতে তারা কতটা সৎ, সে বিষয়ে আমি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিল এ তাদের কংগ্রেস নেতাদের সামনে ভাষণে বলেছিলাম। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, পরাশক্তিগুলির এই প্রচেষ্টা যথোপযুক্ত নয়। অনুরূপভাবে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টেও আমি এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলাম। আমি বলেছিলাম,তোমরা ঠিকমত সাহায্য করছ না। তোমরা বল তো, যদি সদিচ্ছাসহকারে চেষ্টা করতে তবে একটা দারিদ্র পীড়িত দেশ দেখাও যার অর্থনীতি তোমরা উন্নত করে দেখাতে পেরেছ আর সেই দেশটিকে তোমরা উন্নত দেশগুলির সারিতে দাঁড় করাতে পেরেছ। একথা আমি যুক্তরাষ্ট্রেও বলেছিলাম। এভাবেই চেষ্টা করা হয়- ইরাকের উন্নতি হচ্ছিল, খুব দ্রুত উন্নতি করছিল, তাদের উপর বোমা বর্ষণ করে ধ্বংস করে দিলে দেশটিকে। তাদের তেল সম্পদের উপর দখল জমিয়ে বসলে।লেবানন এর আগে উন্নতি করছিল, বেরুত প্যারিস হয়ে উঠছিল উন্নতির দিক থেকে। তাকেও ধ্বংস করে দেওয়া হল। দারিদ্র পীড়িত যে দেশগুলি উন্নতি করছে,তাদের উন্নতি করতে দেওয়া হয় না। অনুরূপভাবে আমি তাদেরকে একথাও বলেছিলাম যে, তোমরা বলছ, সেই সব দেশের সরকারগুলি দুর্নীতিগ্রস্ত। বেশ, সরকারগুলিও দুর্নীতিগ্রস্ত যারা ঠিকমত কাজ করে না।

কিন্তু তোমরা সেই সব দেশের দুর্নীতি দেখেও তাদের সাহায্য করে যাচ্ছেন। যতদিন তোমাদের নির্দেশ তারা মেনে চলছে,তোমাদের ইচ্ছে মত তারা কাজ করছে, ততদিন তোমরা তাদের সাহায্য করছ। যখন তারা তোমাদের কথা শোনা বন্ধ করে দিল, তখন তাদেরকে ছেড়ে দিলে। একই অবস্থা এখন সিরিয়ার। এরা মোটেই সৎ নয়। যখন এসব কিছু হয় আর সঙ্গে অরাজকতা চলতে থাকে, তখন ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানরা আজ এই পথেই চলছে। এই যে বিনাশ ঘটবে তা সমগ্র বিশ্বের জন্য আসবে। তখন ইনশাআল্লাহ্ ধর্মের প্রতি মানুষের মনোযোগ সৃষ্টি হবে। আর ধর্মের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হলে যুগের ইমাম ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে। এই কারণে পরবর্তী কালে বিশ্ববাসীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য ওয়াকফীনে নওদের উপর সব থেকে বেশি দায়িত্ব বর্তায়।

ইরান ও সিরিয়া সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে সম্মেলনে আমি বলেছিলাম। শান্তির বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলাম, সেটা পড়ে নাও। একাধিক জোট তৈরী হচ্ছে। এর ফলে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধবে। কেবল ইরান নয়, ইরান যেহেতু জোট থেকে দূরে আছে, কিছুটা সমস্যার মধ্যে আটকা পড়ে আছে, সেই কারণে ইরানের আগে সিরিয়ার উপর তারা আক্রমণ করতে চাইবে। আর তারা সেটা করবে মুসলমান দেশগুলির হাত দিয়ে। তুর্কির দ্বারা সিরিয়ার উপর আক্রমণ করবে। এরপর যুদ্ধ শুরু হবে। এই যুদ্ধ ক্রমশ ইরানের দিকে সরে আসবে। রাশিয়া এবং চীন ইরানের পক্ষ নিবে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ অন্য দেশগুলির পক্ষ নিবে। দুটি জোট তৈরী হবে। যেভাবে এরা দাবি করছে যে, ইরানের কাছে পারমাণবিক বোমা আছে আর ইরান অস্বীকার করে চলেছে। আর যদি থেকে থাকে, তবে যে হতাশ হয়ে পড়েছে এবং মার খাচ্ছে সে এটা দেখে না যে কে মরছে আর কে মরছে না। তখন যা মনে আসে সে করে বসে। এই অবস্থাই হবে এই দেশগুলির হবে। তাই আমি বলেছি যে,কিছুটা বুদ্ধি খাটাও। কেননা, প্রথমে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই পারমাণবিক বোমা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারা জাপানের উপর দুটি পরমাণু বোমা ফেলে। যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। আমি হিরোশিমার সেই জায়গাটা দেখেছি, সেখানে তারা স্থানটি সংরক্ষণ করে রেখেছে। কংক্রীটের ঘর গলে নীচে পড়ে গেছে সেখানে। সেই বোমা এত শক্তিশালীও ছিল না। এখন ছোট বড় অনেক দেশের কাছে এই বোমা রয়েছে। এমন দেশের কাছেও বোমা আছে যাদের বোধবুদ্ধিও নেই। অনুমান করে দেখ, এর কতটা ভয়াবহ পরিণাম বের হবে। পৃথিবী নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনছে। তাই দোয়া কর যাতে ধ্বংস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর খোদা না করুক, যুদ্ধ যদি হয়েই যায় তবে এরপর কেবল পুণ্যবানরাই রক্ষা পাবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'আগ হ্যায় পর আগ সে ওহ সব বাচায়ে জায়েঙ্গে/ জো কি রাখতে হ্যাঁ খোদায়ে জুল আজায়েব সে পেয়ার।

অর্থাৎ- আগুন কিন্তু আগুন থেকে সেই সব মানুষদের রক্ষা করা হবে, যারা বিস্ময়ের অধিকারী খোদা তা'লাকে ভালবাসে।

এই জন্যই আমি তোমাদেরকে বলি, পুণ্যের দিকে এস, নামাযের দিকে এস, আল্লাহ্ তা'লাকে ভালবাসা যাতে পুণ্যবানরা রক্ষা পায় এবং পৃথিবীর সংশোধনের জন্য কাজ করে।

একজন ওয়াকফে নও কিশোর বলে: লন্ডনে আমি একটি ছেলেকে নিয়ে হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। হুযুর বলেছিলেন, সে মুসলমান হয়ে যাবে। আলহামদোলিল্লাহ সে মুসলমান হয়েছে। সে দুটো স্বপ্নও দেখেছে। কিন্তু এখন সে আহমদীয়াতের দিকে আসছে না।তার জন্য দোয়া করুন। সে নিজে বলছে আর কোন ইসলামই নেই। হুযুর আনোয়ার বলেন-তাকে বল, তুমি মুসলমান কেন হয়েছ? আহমদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তো তুমি মুসলমান হয়েছ। অন্য কোথাও যদি ইসলাম না থাকে, তবে যে পথ দেখে তুমি যে দিকে পথ চলতে শুরু করেছ আর মাঝপথে এসে থেমে গেছ। প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নিজের গন্তব্যে পৌঁছনোর চেষ্টা করে। সে মাঝ পথে থমকে দূর থেকেই গন্তব্য দেখতে চায় না।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir